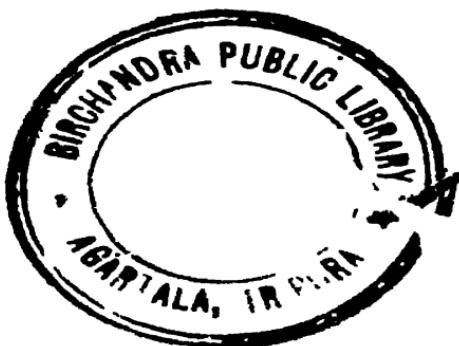


জাহানগ হইতে বিদ্যায়

শওকত ওসমান



আনন্দ পাবলিশার্স' প্রাইভেট লিমিটেড
কলি কা তা ১

প্রকাশক : শ্রীফণ্ডুবগ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীফণ্ডুবগ দেব
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কৌম নং ৬ এম
কলকাতা ৫৪

প্রচ্ছদপত্র :
বাংলাদেশের চিরশিল্পী
দেবদাস চতুর্ভূ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫১

মূল্য : ৫.০০

ନାନ୍ଦୀପାଠ

‘ଦେଶ’-ବିଧ୍ୟାତ ଶ୍ରୀସାଗରମର ସୋଷ ଏହି ଉପନ୍ୟାସେର ଆଦି ଗ୍ରଂଥକାର । ଆମ ବକଳମ ମାତ୍ର ।

ଡେଇଲ ବଛର ପରେ ଆମାର କୈଶୋର ଏବଂ ଯୌବନେର ଧାର୍ତ୍ତୀ କଳକାତାର ବୁକ୍‌କେ ଆବାର ଫିରେ ଏଲାମ । ଏହିକ୍ଷେତ୍ରେ ସାବେକ ଶ୍ରୀଭାନୁଧ୍ୟାୟୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆର୍ଜୀଙ୍କ-ସ୍ଵଜନେର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ କର୍ତ୍ତବୋର ପର୍ଯ୍ୟାଯ ପଡ଼େ ।

ଶ୍ରୀସାଗର-ଶୈକତେ ପେଣ୍ଟିଛନ୍ତି ହୟ । କାରଣ, ବହୁଦିନ କାଲେଭନ୍ଦେ କେବଳ ଦେଶ-ପର୍ଯ୍ୟକାର ମାଧ୍ୟମେଇ ପଞ୍ଚମବଞ୍ଗେ, ସାହିତ୍ୟର କଥା ଶା-ଇ ହୋକ, ଆମାର ଇହକାଳୀନ ଅନ୍ତର୍ଭେଦର ପ୍ରମାଣ ବଜାଇ ରେଖେଛିଲାମ । ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ସନ୍ଦେଶ ପାକ-ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପର ତା-ଓ-ବନ୍ଧ ହେଯେ ଯାଇ । ସାବେକ ରେଣ ରାଖତେ ଏକ ବିକେଳେ ଆବାର ପ୍ରାଚୀନ ଆସରେ ପେଣ୍ଟିଛିଲାମ ।

କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଶ୍ୟେନକର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକାତ-ପଡ଼ା ଏବେଲାର ଦୃଢ଼ ପାଠିରେଛେନ । ସାକ୍ଷାତ-ମାତ୍ର ସାମାଜିକ ଆଚାର ବାଦେଇ ପଥମ ପ୍ରମ “ପ୍ରଜାସଂଖ୍ୟାଯ ଆମାର ଉପନ୍ୟାସ କତଦ୍ବର ଏଗୋଲ ?”

ଥିତିରେ ସେତେ କିଛି ସମର ଲେଗେଛିଲ । ପରେ ବନ୍ଧୁରୀଛିଲାମ, ହାମଲା ଆଜ୍ଞାରକ୍ଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ, ସେଇ ଇଂବେଜୀ ପ୍ରବାଦେର ଗଦା କାମରା-ମର ଘ୍ରାନ୍ତିମାନ । ଉପନ୍ୟାସେର ରଚନା-ସ୍ବର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦନ୍ତିଲ ।

ପ୍ରଜାସଂଖ୍ୟା । ସମୟ ଅଳ୍ପ । ଏହି କାଳ-ଅଜ୍ଞାତରେ କାଳ ଘଟିଲ । ଆର୍ଜୀବିକ୍ଷାର୍ତ୍ତ ବେଶ ଚୋଟ ଥିଲେ । ଆନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଣଦୋତୀର ବିଚ୍ଛରଣ ମାତ୍ର, ବହୁଲାଂଶେ ଗ୍ରହିତ୍ବିଲାମ । ଛୋଟ କ୍ୟାନଭାସେ ଉପନ୍ୟାସ-ରଚନାର କଥା କଥନ ସେବନ ସେବିନ ବଲେ ଫେଲେଛିଲାମ । ଶ୍ୟେନକର୍ଣ୍ଣ ଆବାର ବ୍ୟାଗପଣ ଜୀତିମାର ।

ଅତ୍ୟବ, ପାଁଚ ମିନିଟେ ଖରାଦ ହେଯେ ଗେଲାମ ।

ତଦୁପରି ଆମାର ଆଦିମ-ସ୍ବର୍ଗ ସାହିତ୍ୟ-ସତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିବଜନ ବନ୍ଦେୟାପାଧ୍ୟାଯ ବିଫିଡ଼ିଜୀକେ ଏକଟା କଳମ ଉପହାର ଦିଯେଛିଲ, ସ୍ଥାର ଡଗାଯ ଚିନ୍ତା ଝାଁପରେ ଝାଁପରେ ପଡ଼େ । ଆର ନିର୍ମଳ କାଜ କରାର ଜନ୍ୟ ପରିବେଶନା-ରଚନାର ଭାବ ନିଯେଛିଲ ଏକ ସର୍ବସହାର ବନ୍ଧୁ, ନାମ ନାନା କରିଗେ ଉତ୍ସ୍ର ରିଲେ । ସୋଦରାପ୍ରତିମ ତାହେରା ବେଗମ ଆହାର-ପର୍ବେର ଭାବ ନିଜେର ହାତେ ତୁଲେ ନିଯେଛିଲେନ । ଏବଂ ଆବୁଲ ହୋମେନ ଭାଇ ଉତ୍ସାମ୍ଭୁଦେବ ଜନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନିଜେ ଉତ୍ସାମ୍ଭୁ ସେଜେ କ୍ଷାଳିତ ହନ୍ତିନ, ନିଜେର ଟାଇପରାଇଟାର ମେଶିନେର ସ୍ବର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୋଇବାତେ ସେବେନ ଚାରିପ୍ରମୁଖ ଉଦାରତାଯ, ଏମନି ବେଥେଯାଇ । ଏହିସବ ଆନ୍ଦୁକ୍ଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଅପରିଶୋଧ୍ୟ ଥଣ ।

ଉପନ୍ୟାସେର କ୍ଷୁଦ୍ର କାନ୍ଦାଭାସେର କଥା ପର୍ବେ ଉତ୍ସ୍ରୀଖିତ । ବାଂଲାଦେଶେର ଟ୍ୟାଜେଡିର ପ୍ରକୃତ କାହିନୀକାରେର ‘ପ୍ରେକ୍ଷାଯ ଆଛି । ଅଳ୍ପ ପରିବେଶ ଓ ଏ ସାମାଜିକ ଘ୍ରାନ୍ତିବତ୍ତର ସମ୍ୟକ୍ ପାରିଚାର-ଦାନ କରିଟିନ । ବକ୍ୟମାଣ ଉପନ୍ୟାସ ଏକଟି ମାତ୍ର ମାନ୍ସ-ଲୋକେ ବିଚରଣ । ସେଥାନେ ପରିବେଶ-ମତ ଘେଟ୍ଟୁ ଛାରା ପଡ଼େଛେ । ତାର କୋନ ପଟ୍ଟିଅନ୍ତିମ ଦେଇଯା ହର୍ଯ୍ୟାନ । କେ ନା ଜାନେ ନିମ୍ନଚାପ ସଂକିଳିତ ହୁଏ ବାତ୍ରେର ପର୍ବେ ।

আমার খণ্ডের আরো বোৰা বাড়িয়েছেন আনন্দ পাবলিশার্সের কৃত্তপক্ষ।
তেইশ বছৱ এই রাজধানীৰ বাজাৱ থেকে ধাৰিজ ছিলাম। তবু প্ৰাণিতপৱবশ
তাৰা এগিয়ে এসেছেন। অন্যতম কৰ্ণধাৱ শ্ৰীযুক্ত ফণিঙ্গুষণ দেব এই উপন্যাস-
প্ৰকাশনাৰ খবৱদারী কৱেছেন দেবসূলভ সৰ্বজ্ঞ-বিদ্যমানতাম। আৱ সময়েৱ
সঙ্গে পাঞ্চা লড়েছেন শ্ৰীবাদল বস্ত। তাই অল্প সময়েৱ মধ্যে উপন্যাস ছাপা
শেষ হয়। এ'দেৱ খণ শোধ দেওয়াৱ আমাৱ কোন ইচ্ছা নেই। কাৰণ, তা
একান্তভাৱেই হার্দিক।

শ. ৩.

দৃঃখনী জননী
বাংলাদেশ
ও তার বীর সন্তান
মুক্তিফৌজদের
জন্য

**I am for peace; but
when I speak, they
are for war.**

Bible : Psalm 120

—এখন কী করবেন, শ্বার ?

—তাই ভাবছি ।

গাজী রহমান তার আশ্রয়দাতার মুখের দিকে চেয়ে রইল ।
অপলক চোখ ।

ওই প্রশ্নে যে সে অশেব চিন্তিত তা বোধ যায় । কিন্তু আসলে
সে কিছুই ভাবছিল না । বরং চোখ মেলে ধরেছিল অনিশ্চিত এক
প্রশ্নচিহ্নের উপর, যার প্রতিভাস—সে জানে তার পক্ষে ধরা অসাধ্য ।

গত দেড় মাস হিতাকাঙ্ক্ষী, বঙ্গুবাঙ্কব, আঘীয়স্বজন হঠাৎ-হঠাৎ
তার কাছাকাছি এসে পড়েছে । সকলের মুখে এক কথা : “তোমার
প্রাণ সংশয়াপন্ন, অতএব নিরাপদ কোথাও চলে যাও ।”

গাজী রহমান তার সোজাস্বজি কোন জবাব দেয়নি । কারণ,
সোজা কোন উভয় তার জানা ছিল না । অস্তিত্ব-রক্ষার আদিম একটা
তাগিদ সে অনুভব করত মাত্র । তারপর অপলক চেয়ে ধাক্কত
প্রশ্নকর্তার মুখের উপর অথবা একেবারে শৃঙ্গতায় ছই চোখ ফেলে,
আর সে জানত অতল খাদের ভেতর তার দৃষ্টি শুধু বিশ্রামের একটা
অবলম্বন খুঁজছে, কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না ।

এই গ্রামে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল ইউনুফ, তারই এক পুরাতন
ছাত্র, বর্তমানে কোন সদাগরী ফার্মের কেরানী ।

বত্রিশ বছরের স্তুল মাস্টাফির এমন বহু সুধা-কল তার জগ্নে
এখানে ওখানে অপেক্ষার্থী, তা ধরছাড়া বেরিয়ে পড়ার আগে গাজী
রহমানের কাছে পুরোপুরি অঙ্গানা ছিল ।

শহর থেকে অনেক দূরে, এমন কী বড় জেলা-সড়কে এখান থেকে
পাঁচ মাইলের কম হবে না । আঞ্চলিক জেলা এমন জায়গা

আশা প্রদ। বিশেষতঃ, কোপঝাড় আগাছার অঙ্গল এবং বাঁশ বনে
এই গ্রাম এমন ভাবে ঠাসা যে, মিলিটারী নেহাত প্রয়োজন না পড়লে
এদিকে পা বাড়াতে তিনি বার ভাববে।

অবিশ্বিত গাজী রহমান ওই সব বাধা বিপন্নির উপর আদৌ জ্বোর
দেয়নি।

আধুনিক রণশাস্ত্র নরক-রচনার আর এক আদিম সংহিতা। পাঁচ
সাত মাইল দূরত্ব কিংবা পাঁক কি হেঠো রাস্তা, এসব কোন বাধা
নয়। তবে এই গ্রামের দূরত্বে তেমন কিছু নেই। অবিশ্বিত রাজনৈতিক
কর্মী হয়ত কিছু আছে। কিন্তু তাদের নামডাক এখনই কর্তৃপক্ষের
টনক ধরে নাড়া দেবে, তেমন কিছু না।

সব ভরসা এখানেই জমা করেছিল গাজী রহমান। অবিশ্বিত
সচেতন ভাবে না। কারণ, গত দেড় মাস তার চিন্তার পদ্ধতি যে-কোন
স্থায়িক গন্তব্যে মধ্যে অচল ছিল। নামা স্থূলি এবং ঘটনার ছায়ার
অরণ্যে বিচরণই গাজী রহমানকে উপলক্ষ্যে সিঁড়ি যুগিয়ে যেত।
হংসপ্রের পর তবু অর্ধজাগ্রত অর্ধসূমন্ত অবস্থায় যুক্তির রেশ কিছু
থাকে। গাজীর মগজের কোষে তার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া তুক্কর ছিল।
নিঃসাড়, অস্তুত এক অবস্থা। যান্ত্রিক কতগুলো জৈবিক নিয়ম সে
পালন করে যাচ্ছে। খাওয়ার সময় খাওয়া, ঘুমনোর সময় ঘুমোনো।
যান্ত্রিকতার মধ্যে উদ্ঘাদেরা হয়ত শাস্তি পায়। কিন্তু গাজী রহমান
তো বাতুল নয়। সে পুরাতন হেডমাস্টার। সব জ্ঞান, বিশেষতঃ,
আঘৰ্মৰ্যাদা জ্ঞান এখনও টনটনে। তার কোন প্রশাস্তি পাওয়ার
কথা নয়। হয়ত অস্থিরতার তোড়ে সে ভেসে যেত এবং তাই
সচেতন বোধের সাহায্যে আর কিছুই নিজের কাছে টেনে আনার
ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে সে বিরত থাকত।

পাতলা একহাতা চেহারা গাজী রহমানের, কিন্তু বেশ পোড়-খাওয়া
এবং ধক্কল সহ করার জগতে অস্তুত। পাতলা সাদা দাঢ়ি শেষের
দিকে সুঁচোলো, তার ছোট ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে বেশ
সমতা বজায় রেখেছিল। অথবা দর্শনেই মনে হবে, এই মানুষ কঠিন

কোন সাধনার পশ্চাতে তৎপর এবং চোখ অবিষ্টের দিকে সদা-
জ্ঞাগর। ফলে, উজ্জলতা ছড়িয়ে সম্মুখাভিসারী। এমন নয়নের
আত্মপত্রের নীচে ইউন্ফ কেন, বহু ব্যক্তিকসম্পন্ন মাহুষকে অসোয়াভি
অনুভব করতে দেখা গেছে। তুরপুনের মত চোখ যদি বিঁধে বিঁধে
যায়, নিজেকে খামোকা অপরাধী মনে হবে যে-কোন মাহুষের।

ছাত্রের পথে গাজী রহমান ঈর্ষণ নাড়া খেয়েছিল মাত্র। কিন্তু
তার মন নিজস্ব কায়দায় এগিয়ে যায়। সেখানে সিদ্ধান্ত খাড়া
থাকে না। কাত হয়ে একে অপরের গায়ে ঢুক চলে পড়ে, অতি
ক্রত। তারপর প্রশ়ংসনীয় দ্বন্দব্য জায়গাটা শাসন করে। আভাসে
ছিটেকোটার ইতঃক্ষিণ্ঠার মোটামুটি একটা ধারণা গাজী রহমানের
আশেপাশের লোক করতে পারে। কারণ, যখন একদম একা থাকে
না, তখন আটপোরে কথা তো সে বলে। তাঁর মিজের কাছে অনেক
সময় স্থানকালের সঙ্গতি হয়ত থাকে না। কিন্তু দেড় মাসে
বাংলাদেশের বাতাস যে আর্তনাদ মাত্র, তা কার কাছে অজ্ঞাত?
তাই গাজী রহমানের কথার অর্ধেকার তেমন কঠিন কিছু নয়।

অবিশ্বিত গাজী রহমান জেনেছিল, এই বাড়ীতে তার বেশী দিন
থাকা কঠিন।

সম্পত্তি যে খবর এসেছে, তা তেমন চাকল্যকর কিছু নয়। কয়েক
দিনের মধ্যে এই গ্রামে হামলা শুরু হবে, কিছু ঘাগী আওয়ামী
লীগারের থেঁজে।

গাজী রহমানের সিদ্ধান্ত এসেছে কিন্তু অগ্রদিক থেকে। ইউন্ফের
বৌ সখিনার ভাই খালেদ ঢাকা বিশ্বিশ্বালয়ের ছাত্র ছিল। দেড় মাস
তার কোন খোজ নেই। পিতৃমাতৃহীন বোনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল
সে। ইউন্ফের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। কিন্তু খালককে সাহায্য
করত। নানা ধরনের কৃচ্ছ্রতাসাধন মারফত খালেদ তার লেখাপড়া
চালিয়ে নিত। সে আরু ফিরে আসেনি। শোকের প্রথম স্তর
কেটে ঘাওয়ার পর গাজী রহমান এই বাড়ীতে আসে। অবিশ্বিত
পুরোপুরি শোকের পর্যায়ে গোটা ছঃখটাকে কেলা অঞ্চায়। সে বেঁচে

থাকতে তো পারে। ঢাকা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। জোয়ান
স্বাস্থ্যবান যুবক থালেদ হৈটেও তো চলে আসতে পারত। অথব
কয়েকদিন ঘানবাহনের অভাব, একটা স্টোকের কাজ করেছে সখিনার
মনে। কিন্তু আর তো মন প্রবেশ মানতে নারাজ। গাজী রহমান
এমন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছিল। সেও এখানে থাকতে
চায়নি। কোনু রকম শারীরিক অস্ফুরিধা? তা না। তার খাওয়া-
দাওয়ার স্বল্পতা দেখে সখিনা খুবই বিব্রত। ইউনুফ পর্যন্ত অভিযোগ
উত্থাপন করেছে, “স্তার, আপনাকে বাঁচাতে তো হবে।”

কিন্তু বাঁচার উপাদান কী আছে কোথাও? এই বাড়ীর পটভূমি
ঘিরে রয়েছে একটি তরুণের মৃত্যু। তাই অসোয়াস্তি। কিন্তু এই বাড়ী
হেড়ে গেলেই কী মৃত্যুর ছায়া সে ডিঙিয়ে যাবে? কোথায় মৃত্যু
নেই? শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের মাঝুষ এই গ্রামে বসে সান্তাজের
উত্থানপতন দেখেছে অথবা উপকৃত শহর হেড়ে স্বর্গকল্প নিসর্গ-সবুজের
সামিথ্যে যেমন বাঁচার শক্তি সঞ্চয়, তেমনই বিপদের কাল-গণনা
করেছে। আজ চতুর্দিকে তারা নিরাশ্রয়। কিছু দিন পূর্বে একটা
অলস্ত গ্রাম দেখতে বাধ্য হয়েছিল গাজী রহমান। পাঞ্জাবী
সৈঙ্গণ্ডো তিন মাইল দূর থেকে আগুনে বোমা নিক্ষেপের পর বিনা
হামলায় সামনে এগিয়ে চলে গিয়েছিল। আর এক বড় ঘাঁটি ছিল
গন্তব্য। পেছনে নিরাপদ থাকার জন্যে এই আতঙ্ক বিস্তার।

বাংলার গ্রামে কী আগে কখনও আগুন লাগেনি? গেরস্তর
অসাবধানতা-জ্বাত অগ্নিদাহনের বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কিন্তু
তখন গ্রামের সমস্ত গাছগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেত না। এমন এক
শক্তির পরিচয় আবহমান কাল থেকে ইতিহাসে কখনও পায়নি
বাঙালী। তাদের কী আখ্যা দেবে—জ্বত, দানব বা আর কিছু,
তা-ও বাঙালী কোনদিন স্থির করতে পারবে না। তেমন ঘৃণা
প্রকাশের ভাষা বাঙালীর কাছে এখনও অজ্ঞাত। তা হয়ত
ভবিষ্যতে তৈরী করবে তার চারণ কবিয়ন্দ।

মৃত্যুর কাফনের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। গাজী রহমান এই

বাড়ীকে মেনে নিতে বেশ বেগ পেয়েছিল। খালেদের মৃত্যু সংস্কে
সে নিশ্চিত। তারই এক সহপাঠী বহু ছপিচুপি থবর দিয়ে
গিয়েছিল। ঘুমস্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অবিভিত্তি লাশ কেউ
দেখেনি। কিন্তু তার বালিশ বিছানায় প্রচুর রক্তের দাগ ছিল।
সিদ্ধান্ত সেখান থেকেই।

গাজী রহমান এখানে বাড়ীর সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।
কিন্তু নিঃসঙ্গতার প্রতিধাত তাকে আচ্ছান্ন করে রাখত সদাসর্বদা। তার
স্মৃতিপাত এই বাড়ীতে কি না, সে বলতে পারবে না। অমন দয়াময়ী
বধূমাতা সখিনা। ফরসা মুখ ফ্যাকুশে হয়ে গেছে ভায়ের কথা ভেবে
ভেবে। কিন্তু খাতিরদারীতে কী আন্তরিকভাবে তৎপর! স্বামীর
শিক্ষকের বিপদের কথা সে জানে। কিছুটা করুণাপরবশ হয়ত
মহিলা। কিন্তু তেমন আঁচ পাওয়া যেত নী ব্যবহারে। সবই
কর্তব্যের তাগিদে করা, যে-কর্তব্যের পেছনে স্নেহ শ্রদ্ধার সম্পর্ক
সর্বদা দীপ্যমান। সখিনার এই হৃদয়বন্তা প্রাচীন শিক্ষককে বেশ
হৃঃসাহসী করে তুলেছিল। নৈতিকতার মাপকাটি তাকে যতই
আরো অস্ত্রিতা দিক, শেষ পর্যন্ত ডাহা মিথ্যা কথা বলতে তার
এতটুকু আটকায়নি।

—সখিনা-মা, খালেদ মৃত্যুফৌজে যোগ দিয়েছে।

—আপনে ক্যামনে জানতেন?

সন্দিক্ষ, তবু আশাহৃত সখিনা তখনই প্রশ্ন ছুঁড়েছিল।

—আমার কাছে থবর এসেছে।

সখিনা সেদিন নিজের স্বভাবজ বিষয়ত নিমেষে কাটিয়ে উঠেছিল
এবং জবাব দিয়েছিল, “কিন্তু আমার লগে একবার ঢাখ্যা কইরা
গ্যাল না ক্যান?”

—মা, সময় কোথায়? হঠাৎ কোন ছঁশিয়ারি না দিয়ে
ডাকাতের মত পাঞ্চাবী নেকড়েরা গোটা দেশের উপর ঝাঁপিয়ে
পড়ল। কেউ কী প্রস্তুত ছিল? যাদের হাতে বন্দুক দেখছ, তারা
কী কোনদিন ভেবেছিল হাতে বন্দুক নেবে?

—তা ঠিগু মাস্টার সাব। আপনে আরো খোজ নেন। মা
নাই, বাবা নাই—একড়া ছোড় বাই, হেরেও যদি আল্লা নেয়—

—তুমি দোয়া করো মা, আল্লা তোমার ভাইকে আবার
কাছে এনে দেবে।

সেদিন থেকে এই বাড়ীর আবহাওয়া অনেকটা বদলেছিল। কিন্তু
গাজী রহমান সোয়াস্তি পেত না।

অনেক রাত্রে ঘূর ভেঙে গেলে সে বারান্দায় একা একা অঙ্ককারে
নিজেকে প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত এবং পাগলের মতই
কোন যুক্তিযুক্ত জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করত না। মিথ্যার মলাট
ধর্মগ্রন্থের উপর চাপিয়ে দিয়ে হয়ত রক্ষা পাওয়া যায়। বছকাল পরে
পরবর্তী পুরুষ তার খেসারত টেনে নাজেহাল, শেষে যুক্তির রাস্তা
খোঁজে। কিন্তু একটি রমণীর বুকে ঈষৎ আত্মবল যোগানোর জন্যে
কি ছলনা প্রয়োজন ছিল? যদের আয়োজন চতুর্দিকে। নদীনালায়
বোপেরাড়ে গঞ্জে বন্দরে, মাঝুরের নিভৃত কক্ষে; পথে প্রাণ্তরে।
এই কাঁচাতারের জাল ক্রমশ চতুর্দিকে বিস্তারিত হচ্ছে, যার
রগড়ানির ভেতর আহতের গোঙানি, ধর্ষিতার আর্তনাদ, অসহায়
ফরিয়াদ সব একাকার পাক খাচ্ছে শব্দের একটি বিশাল কুণ্ডের
মধ্যে। তখন একটি মৃত্যু, একটি মৃত্যুর জন্যে কেন এত খেদোভিতি?

গাজী রহমান অবিশ্বিত সেদিন নিজেকে শান্ত করতে সক্ষম হয়।
নিজের মনেই আবার সাঁতার কেটেছিল, যার বুদ্ধদের দল সংলগ্নতায়
কিছু অর্থ বয়ে এনেছিল বৈকি। কিন্তু মৃত্যু হয় ব্যক্তির, একটি
ব্যক্তির। একুনে তা হাজার লক্ষ কোটিতে পরিণত হয়। এই সংখ্যার
মূল্য নেই। কিন্তু প্রত্যেক সংখ্যার পেছনে যে ব্যক্তি আছে, তা
নিতান্তই নিজস্ব ছায়াছবি, স্মৃতি—এক কথায়, গোটা ব্যক্তিসমস্ত—
জ্ঞানান দিতে থাকে, জ্ঞানান দিয়ে যায়, আত্মীয়স্বজনের কাছে, অনক-
জননী, দয়িত বা দয়িতার কাছে, স্মৃহদের নিকট। একক ব্যক্তি যখন
চোখ থেকে হারিয়ে যায়, তখন যে-কোন আদর্শ নিষ্পত্তি হতে বাধ্য।
তার একটা নির্বস্তুক ক্লপ নিয়ে তুমি বুঁদ থাকতে পারো, আদিম মাঝুর

যেমন তার পিতৃপুরুষের কবর দেখে প্রেতাগ্নিত হয়, তেমন স্থুমি
রোমাঞ্চিত হতে পারো ভঙ্গি-গদ্দগদ, কিন্তু তার মধ্যে আর বক্তু-
মাংসের উত্তাপ থাকে না।

এমন সব সিদ্ধান্তে নিজের কায়দায় পৌছেও কিন্তু গাজী রহমান
সোয়ান্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সখিনার সঙ্গে সব কথা এক গন্তব্যে
পৌছত। আবার শোনা যেত বেতারের সংবাদ।

—মাস্টার সাব, কস্বা এলাকায় মুক্তিফৌজ হানাদারদের খুব
মারছে। বাঙালীর লগে লড়তে আইছে কোন্ মুল্লুকথন। অহন
দ্যাহো।

—হ্যাঁ, মা। আমাদের ফৌজ তো আর টাকার জন্মে লড়ে না।
তারা দেশের জন্য লড়ে।

—খালেদ একবার আইত!

—আসবে, মা। আসবে বৈকি।

ইউসুফ কাছে এসে পড়লে অবিষ্টি কথার মোড় নিত অন্তদিকে।
এই খেলার রহস্য সে বোবে। সখিনার সমীহা-জাত বিশ্বাসের
ফলে বাড়ীর আবহাওয়া কিছুটা যে বদলে গিয়েছিল তা তার মনেও
এক ধরনের প্রলেপ মাথিয়েছিল, যা বেকার জীবনে বিশেষ সাম্পন্ন।
সদাগরী অফিসগুলো দেড় মাস হয়ে গেল এখনও খোলেনি।
হয়ত অফিসের মাথাগুলো উড়ে গেছে। আর কোনদিন খোলার
সম্ভাবনা কম। শহরের রোডগার এবং গ্রামে জমিজিরাতের আয়
মিলিয়ে ইউসুফ এক ধরনের মানসিক নিরাপত্তা ভোগ করত। আজ
সেখানে চিড় ধরেছে। তার উপর খালেদের যৃত্য তাকে স্পর্শ
করেছে বৈকি। অতিশ্রদ্ধেয় শিক্ষক কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে
যদি তাদের পারিবারিক জীবনে সামাজ্য সহজভাব এনে দিতে
পারেন, অপরাধ কোথায়?

গাজী রহমান কিন্তু ছাত্রের সামনে নিজেকে বড় ছোট মনে
করত; যখনই সখিনার সঙ্গে মুক্তিফৌজ-সংক্রান্ত কোন কথা
চলাকালে এসে পড়ত ইউসুফ। শিক্ষক অতি মজলিসী মানুষ

ছিলেন একদা, অস্তত দেড় মাস পূর্বেও। আজকাল সেই মুখ বঙ্গই থাকে। ওর অবয়বের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়, কৌ যেন গভীর তম্ভয়তার মধ্যে সে ডুবে আছে। সখিমা গাজী রহমানের মুখের দিকে চেয়ে, সেখানে কোন আশ্বাস দেখলেই তবে ডাক দিত অতি আদরের সঙ্গে: মাস্টার সাব।

সঙ্ঘোধনের ফলে গাজী রহমান নিজেকে ছেড়ে কিছুটা বেরিয়ে আসত এবং সহজ গলায় সব পরিবেশ ভঁজে তুলত স্নেহের আচ্ছল্লতায়। হয়ত কৃত্রিম একটা প্রচেষ্টা তাকে নিতে হতো প্রথম ধার্কায়। কিন্তু তারপর যতটুকু সময় ছজনে কথাবার্তা হতো, তার মধ্যে কোন খাদ এসে মিশত না।

এখানেও পরিষ্কৃতি মাঝে মাঝে বিগড়ে যেত।

বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ শিক্ষক কিন্তু সরল গ্রাম্যবধুর সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে হঠাত নিজের সঙ্গে সংলাপ জুড়ে দিত, বাইরে যার কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু ভেতরে বেশ তপ্ত হয়ে উঠত গাজী রহমান এবং আত্মসঙ্ঘেখন চলত: সে একটা ডাহা মিথ্যেবাদী, অকারণ একটি বিশ্বাসপ্রবণ মনের উপর জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন তো দিনের আলোর মত সব প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আঘাত সইতে পারবে স্নেহাঞ্জ! এই কচি প্রাণ?

এমন প্রশ্নের সম্মুখে শিক্ষক যুক্তির দড়ি ঝুলিয়ে উল্লিঙ্ক কোন প্রশাস্তির ডাল পাকড়ানোর জন্যে তৎপর হতো। মহাকাল আছে সম্মুখে। দু দগে ঘা পর্যন্ত মুষড়ে যেতে থাকে তার অদৃশ্য ফুৎকারে। একদিন সত্য যখন বিবৰ্জন জ্ঞানান দেবে তখন দাগ অনেক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মিথ্যের চেহারা তো মান হবে না, বরং আরো কুটীল দস্তসহযোগে বিকৃত বদনে তা ব্যঙ্গ হেনে যাবে।

অন্যান্য অস্তিরতার সঙ্গে এই বাড়ীর হেন পরিবেশ গাজী রহমানকে আরো নিজের ভেতরে সেঁধেতে অহুপ্রেরণা যোগাচ্ছল। তাই তো সে নিঃসঙ্গ-যাত্রায় সাধারণ যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে আর কিছু বোঝার চেষ্টা পেত না। অপরাপর মাঝুমের সামিধ্যে যখন সহজ

ইওয়ার চেষ্টায় গলদৰ্শ হতো, তখন আজীবন রবীন্নভক্ত সে নিজের
মনেই কখনও কখনও সচেতন অথবা নীরব বা সরব আউড়ে চলত :
“হেখা নয়, হেখা নয়, অস্ত কোনখানে !”

যত্নণা মিছিল করে আসে ।

মৃত্যুর মণ্ডপ বাংলাদেশের আকাশে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ হচ্ছে ।
দৈহিক বিনষ্টির মহড়া এখানে গোপনে হয় না । তালঠোকা কায়দায়
রাঙ্কস এক এক দিক থেকে হঠাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দস্তকড়মড়
আশুরিক চীৎকার ঘোগে, সব আহাজারী মেশিনগানের আওয়াজে
ডুবিয়ে দিতে । এই চণ্ডীতির মোকাবিলা শুক্র হয়েছে একটু
বিলম্বে । বিনা প্রস্তুতি, সহসা—অনেকটা আরেগের বেঁকে বেঁকে ।
সাম্ভূত আছে, ওই দস্তী অশুরের পাঁজর অস্তি একদিন বাংলার
মাটির উর্বরতা-বৃক্ষের উপাদান হবে । কিন্তু আবহান বাংলাদেশের
আস্থার চতুরে—যার সদা-সমুজ্জ্বল কুহকের টানেই তো বাংলার
সন্তান আবার জেগে উঠে, ধার ফলে সহস্র বিকৃতির মধ্যেও
বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগরই থাকে, পাকিস্তান উপসাগর হয় না
কোনদিন—সেই মণিকুণ্ডিমের উপর এ কী বিষ্টার প্রলেপ ছড়িয়ে
দিচ্ছে কবক্ষবাহিনী ? যত্য আর মিথ্যার জাল এখানে নিঃখাসের
বাতাস ।

সখিনার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে, এমন সব চিন্তার উদয় হলেই
গাজী রহমান বিনা ভূমিকায় অসং শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকত ।
দিনে তো সে কোথাও বেরোয় না । অনেককালের শিক্ষক, কখন
কোন পুরাতন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় । তখন গ্রামে তার
উপস্থিতি হয়ত চাপা থাকবে না । সকলে তো ইউনুফ নয় ।

নিঃসঙ্গতার মোকাবিলায় আজকাল একটি সৌম্য চেহারা উত্তরবাট
বুদ্ধের আদল গাজী রহমানের চোখে বার বার ভেসে উঠত । শুধু
দৃঢ় নয় । শুনতে পেত সেই বুদ্ধের কাঙ্গা, যাকে বালকের মত
একপক্ষ কাল আগে নৌকার উপর দশ-বারে। অন কচিকিশোর
এবং বৃক্ষ যাত্রীর সামনে সে কাঁদতে দেখেছে ।

ডুকরে-কাঙ্গা এমন হৃদয়তেদী হতে পারে, গাজী রহমান আগে কখনও উপলব্ধি করেনি। আর কোনদিন সেই বৃক্ষের সঙ্গে হয়ত সাক্ষাৎ ঘটবে না বাঞ্ছাকুক এই কালের প্রাচ্ছণে, কিন্তু হজনে একই যন্ত্রণার শিকার। আশ্চর্য, সেদিন গাজী রহমান নৌকায় আর দশ-জনের সঙ্গে চুপচাপ বসেছিল, খেয়ালও করেনি সেই কাঙ্গা বিভীষিকার মত হন্তে হয়ে তার পিছু পিছু ঘূরবে। একটা কথাও হয়নি আহত-আঘাত সেই মানবসন্তানের সঙ্গে।

নরসিংহি এলাকা থেকে তারা নবীনবগর যাচ্ছিল।

মেধনার উভাল বিক্ষুক টেউয়ের জন্য নয়, নৌকার সকল যাত্রীই সেদিন যে-যার নিজের ভেতর সেঁধিয়ে বসে ছিল।

মাঝি পর্যন্ত চুপ।

আজকাল বাংলাদেশের গঞ্জ বন্দর আর কলকোলাহলের ডিপো নয়। অনেক থিতানো মনে হবে এখানকার নর-তরঙ্গ। হাঁকডাক চীৎকার যে নেই তা নয়। তবে তা যেন মাপাজোকা। গঞ্জের পর হয়ত আদিগন্ত মাঠ শুরু হয়। সেখানে স্কুলতা চিরাচরিত। এক স্রোতের আওয়াজ, পাখির ডাক কি দাঢ় টানার শব্দ—এমন কয়েকটিতে নিনাদ-ভাণ্ডার সীমিত। আজকাল মনে হবে, প্রাস্তর আর গঞ্জ-বন্দরের মধ্যে কোন মিতালি চলছে, যার ফলে মৌনের শাসনই দুই দিকে যথাসন্ত্ব অঙ্গুশ থাকে। লোকালয়ে পর্যন্ত এই রাজৰ বিস্তৃত। পাশের অচেনা সোকটা নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ কি গোয়েন্দা নয় কে বলবে? অবিখাসের অন্তর্ভুক্ত স্বতো এই ভাবে গিঁট পাকিয়ে রয়েছে। অনেকে পথেঘাটে তাই যথাসন্ত্ব সংযত-বাকৃ। হাসির আওয়াজও কানে পড়ে না। হ-চারঙ্গ হঃসাহসী অবিশ্বিতা-পরোয়া, কথা বলেই যায়। এই নৌকায় তেমন একজনও ছিল না।

সাদা দাঢ়ি-সমবিত, খালি-গা, পরনে লুঙ্গি, কাঁধে গামছা, বৃংড়া
মাহুষটি কৃতকশ্রেণীর। চেহারায় অমজ্ঞাত কাঠিন্য এই বয়সেও
চাপা পড়েনি। নৌকার গলুয়ের মুখে সে চুপচাপ বসে ছিল।
অত্যন্ত চিন্তামগ্ন। মাঝে মাঝে মেঘনার পানি সে চোখেমুখে
ছিটিয়ে নিছিল। বোৰা যায়, হয়ত মাথা ধরেছে বা ডেতে
কিছু ঘূর্পাক থাচ্ছে। বার তিন হাই তুললে পর্যন্ত বৃক্ষ। নৌকায়
তেমন শুড়ের-নাদা ভিড় ছিল না। দ্রুত-তিনজন চেপেচুপে বসলে
ওর কাত হওয়ার একটা স্মৃযোগ হতে পারে। বৃক্ষ তেমনই একটা
স্মৃযোগ খুঁজছিলেন। তা একটু পরে জানা গেল। চোখেমুখে
দ্রুত-তিনবার জল ছিটিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে
একটু জায়গা দেওয়ার জন্যে ইশারা জানান। বয়োজোষ্ট মাহুষ।
তার উপর চেহারায় সেই ছাপ বর্তমান, যা স্বতঃই শ্রদ্ধার উজ্জে
করে। আশেপাশে কেউ, সামাজিক অস্মুবিধি সঙ্গে নিঃশব্দে বৃক্ষের
অমুরোধ-পালনে ঘন দিলে। বেশ অনেকখানি জায়গা হল।
মজুর ব্যক্তি লস্বা শুয়ে পড়তে পারতেন। কিন্তু অপরের অস্মুবিধির
দিকে এই মাহুষের এমন খেয়াল যে, নিজের শরীর খুব কুঁচকে,
হাত বালিশ বানিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। মোটা মাহুষ। কাজেই
খাড়াইয়ে অস্তত গ্রহণ, মাদ্বর ধরনের এক লোক ওখানে শায়িত।
অনেক যাত্রীর চোখ সেদিকে ধাইছিল নেহাত অকারণ।

হঠাতে বৃক্ষ ধড়মড়িয়ে উঠে বসলন এবং তারপর উবু অবস্থায় দ্রুই
হাতে মুখ কুঁজে ফুঁপাতে লাগলেন।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল। কিন্তু একজন বর্ষায়ানের এমন
অবস্থা দেখলে কে আর নির্বিকার ধাকবে? সকলেই জিজ্ঞাসাবাদে
ঐগিয়ে যায়।

সেদিন নৌব ছিল কেবল গাজী রহমান। চোখ দিয়ে সব
অনুধাবন করছিল সে, মুখ খুলছিল না। নিজের চিন্তায় বুঁদ বিধায়
সে চোখের উপর সব ছেড়ে দিয়েছিল। তাই বলে সে একদম
আস্থামগ্ন তা বলা অবিধেয়।

বৃক্ষের ফোপানি দিয়ে শুরু, কিন্তু ক্রমশঃ স্বরগ্রাম চড়ে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে তিনি ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। বয়সকালে শিশুত ভর করে বসে। এ বৃক্ষের বয়স এখনও তেমন পর্যায়ে নয়। তা ছাড়া এখনও বেশ ডাঁটো আছেন তিনি। এমন বালক-শূলভ ব্যবহার তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। সকলেই তাই অবাক হয়ে যায়।

শেষে একজন বৃক্ষের গায়ে হাত দিলে ঈষৎ মৃদু ধাকার সাহায্যে সহজ চৈতন্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

ফল অবিশ্রিত পাওয়া গেল।

বৃক্ষ মুখ খুললেন এবং ডুকরে-গঠার ফাঁকে ফাঁকে, “বেইমান হয়ে ছনিয়া থেকে যেতে হল, আঙ্গা—” এই কথা ক'টা জুড়ে দিলেন।

এতক্ষণে নিঃসাড়া একটু চিড় থেল।

যাত্রীদের মধ্যে এবার এক সঙ্গে অনেকের কথা বলার তাগিদ চাগান দিয়ে ওঠে। বৃক্ষ জবাব দেয় না। নিজের বেইমানীর অঙ্গুশোচনায় তিনি অঙ্গুর, এইটুকু বেশ জানা গেল। কিন্তু কিসের বেইমানী? কৌতুহল সহযাত্রীদের কুরে কুরে যেতে লাগল। ছাই-তিনজন অতি সমব্যাপী মেঘনার পানি ছিটোয় বৃক্ষের মুখে। কান্না প্রশংসিত হোক। থামুক তার আবেগের প্রচণ্ডতা।

—জ্যাডা আর কাঁদেন না। কী হয়েছে কন?

একটি শুরু কর্তৃ হঠাৎ সরস হয়ে উঠল এই সময়।

—জ্যাডা!

আবার স্নেহমথিত উচ্চারণ।

বৃক্ষ এতক্ষণে থামলেন। যদিও ফোপানি মাঝে মাঝে অজানিতে চলে আসে।

তারপর সকলে উৎকর্ণ। জ্যাডার বয়ান শুনতে লাগল।

নবীনগরের দিকে কোন এক গ্রাম তার গন্তব্য। এসেছিলেন এক আঞ্চীয়ের খোজে নরসিংদির শিবপুর অঞ্চলে। এক সাবেক বঙ্গুর দোকান ঈ গঞ্জে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎও অন্তত উদ্দেশ্য। কিন্তু

অর্তক্রিত পাঞ্জাবী সৈঙ্গদের আক্রমণের কলে কোন রাস্তাই আর থাকেনি। পালানোর সময় এক জায়গায় ধরা পড়ে যান, বয়স এবং তাকে দিয়ে বেগোর খাটানোর এখনও সম্ভাবনা আছে—এই হই দোহাইয়ে।

একদিন মিলিটারীদের বেগোর তিনি খেটেছেন বেগোর আহার।

তার জগ্নে বর্ষায়ানের কোন ছঃখ নেই। সব অনুভাপ অনুশোচনা অন্তর্থানে।

বৃক্ষের মুখেই তা শোনা যাক :

“আট-দশজন মিলিটারী হইব। হগ্গলের হাতে মেশিনগান। আমরা বিশ-তিরিশ জন। আমাদের কইল, চলো। ইঁটতা থাকি। এ ক’দিন প্যাডে বাং (ভাত) নাই। শরীর কাহিল। তয় নাচার। আমরা ইঁটতা থাকি। বেশী দূর ইঁটতা হয় না। দেড় মাইল হইল। কিন্তু মনে লয়, হাজার মাইল ইঁটছি। পা আর চলে না। একডু জিরাইতা চাই। তহন গালি ঢায়, এই বাঙালী শুয়ার কা বাচ্চা, কদম হেলানে নেহি সাকৃতা? ”

বাপজ্জানরা, ইঁটতা আইলাম নরসিংদি বাজার। একডা মাঝুষ নাই বাজারে। হব পালাইছে। ক্যামতে থাকবো এই জলাদগো সাম্নে? এগুলা মান্বের আওলাদ না। রাস্তার ধারে দেখছি হই বছরের ছাওয়াল পইড়া আছেগ্য। কাউয়া ঠোকর দিতাছে লাশের চোখে। বেগুনা (নিরপরাধ) চাচ্চাদের মারে। এগুলা মান্বের আওলাদ না।

বাজারে ত আইলাম। সব বিরান। ভাবলাম, শয়তানদের মনে কি আছে কে জানে? কয়েকডা বড় দোকান পাশে পাশে। এহানে হডাং চিক্কির দিলে এক মিলিটারী, ‘এই রোকো।’ বা-জান্না, হাল্লাক হইছি। নাকের উপর দম। তয় রক্ষা। একটু দম নিতা পারি। কিন্তু হেকী আর নসিবে আছে। পিস্তল দিয়া ফড়ফড় শব্দ কইরা হব দোকানের তালা ভাইঙ্গল। আমরা ভাবি, অহন বুঝি আমাদের মাইরব। তা কইরল না। তিন-চার মিলিটারী

এক লগে চিকির দিয়া উঠল, ‘এই দোকান কা অন্দর যাও।’ দোকানের ভেতর যাওয়া লাইগব ক্যান? এর ভেতর আমাগো জান যাইব। হগ্গলে দোনা-মোনা। নিজের ইচ্ছায় কে আর কবরে সাঙ্গাইতে যায়। হগ্গলে দোনা-মোনা। আমাগো লগে কয়েকজন জোওয়ান পোলা ছিল। তাগোর একজন সাহস কইরা কইয়া ফেলাইল, ‘কিংউ অন্দর আয়েগা?’ হে বুলাম উচ্ছুর্ক কইতা পারে।

‘আরে শালা বাং করতা? অন্দর যাও।’

‘কিংউ?’

মিলিটারী ধৰ্ম কইরা আইয়া হে জওয়ানের মুখে তিন-চার ঘুষি মারল আর কইল, ‘অন্দর যাও, আওর লুটো।’

লুটের হকুম দিতাছে। ক্যান? ফের দোনা-মোনা, দোনা-মোনা। লুট করন পইড়ব ক্যান? তাগোর মতলব কী, কোন দিশা পাই না। কিন্তু জোয়ান তিন-চার পোলা, বুকের পাড়া আছে বা-জান, ফের জিগাইল, ‘লুট কিংউ করেগা?’ আমার মুখে আইব না, বা-জানরা। এবার মিলিটারী দুই শুয়ারের পৃঁপচা খিস্তি কইয়া কইল, ‘লুট করো। এসব হিন্দু কা দোকান হায়।’

প্রতিবাদ করে জওয়ানেরা, এসব নাকি মুসলমানের দোকান। হেরা বালামৎ (ভালমত) জানে। তয় কী পেছায় মিলিটারীরা। শেষমেষ কয়, ‘বাঙালী শালালোগ কা দোকান হায়। লুটো, লুটো।’

সাবাস আমাগো জওয়ান। একজন বেশ তাগদের সঙ্গে জিগায়, ‘গুনা (পাপ) হোগা নেহি? দোস্রে কা চিজ।’

‘আরে এ শালা ত মসজিদ কা ইমাম কী তরহ বাং করতা?’ তার দিকে থেঁকাইয়া যহন আগায় মিলিটারী তহন আরও চার-পাঁচ জওয়ান সাম দিলে, ‘আলবৎ গুনা হইব।’

এই পাঁচ জনরে আমাদের সামনে এককাতারে কইরা মেশিনগান চালাইল। আহ...। পাঁচ-পাঁচজন জওয়ান মরদ পোলা...কইতা পারুম না, বা-জান। তহন কাঁদছি, কাঁদছি। চোখে কিন্তু পানি

হিল না । বুক তড়পায় ডাঙায় লাকাইয়া-পড়া মাছের লাহান ।
আহ... ।

পাঁচ মিনিড বাদ আমাগো পালা । আমাগো কয়, ‘লুটো । লুটো ।’

তহন আর কী করা ! জ্বোওয়ানের লাহান না আছে বুকের
তাঁগদ, না আছে মনের তাঁগদ । লুট শুরু করলাম । হালারা
টাকাকড়ি সোনাচাঁদি হব লইল । আমাগো কয়—মাল লে যাও ।
একের পর এক দোকান আমরা লুড় করলাম । হিস্তা—হেই এক
রকম । হেরা টাকাকড়ি সোনাচাঁদি লয়, আমরা মাল । হটা কাপড়,
একটা ধালা—হেইজাতী লোয়াজিমা । আমাগো মুজিবর রহমান যে
কইছে, পশ্চিম পাকিস্তান গোস্ত থায় আর আমরা তার হাড় চুরি ।
একদম হাঁচা কথা । এহানেও, বা-জ্বানরা, হেই তামাশা দেখলাম ।
আমরা লুড় করি, হেরা আবার ফড়ো তোলে । ফড়ো তোলে
ক্যান ?”

গাজী রহমানের কানে এখন স্পষ্ট বাজে এক নেপথ্য-জবাব,
যে-মুখের আদল আজও তার কাছে এতটুকু বাপসা হয়নি ।

বোধ হয়, কোন বিখ্বিষ্ঠালয়ের ছেলে উপকৃত এলাকা ছেড়ে
নিরাপত্তার খোজে বেরিয়ে পড়েছে । সে বলেছিল, ‘জ্যাডা, ফটো
তুলছে । কারণ, দুনিয়াকে দেখাবে বাংলারা লুট করে আর
পাঞ্জাবীরা শাস্তি বজায় রাখে ।’ কথাগুলো আবেগের বশেই ছেলেটা
বলে ফেলেছিল, ধারণা করা যায় । তারপর সে আর মুখ খোলেনি ।
চোখ নামিয়ে নিয়ে স্তুক হয়ে বসেছিল ।

গাজী রহমান তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার আদল দেখে নেওয়ার
স্মরণ পায় । কয়েকদিন শেভ করেনি । খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি-
গোঁকে মুখ বোঝাই । দৃঢ়তা যেমন আছে তার দেহের বাঁধনে,
তেমনই মুখ্যবয়বে । একবার সন্দেহ চুঁ মেরেছিল গাজী রহমানের
মনে । হয়ত বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনীর সদস্য । তাই নিজেকে
সে হঠাতে উন্মুক্ত করে ফেলেছিল । এই মুখ গাজী রহমান বার
বার দেখেছিল, তবু তৃপ্তি মেটেনি সেন্দিন । আপন জ্বননী আর দেশ-

জননীকে এই তরুণেরা 'এক করে নিতে পেরেছে। অকুত্তোভয়তা, সাহস, নৈতিকতা, দুর্জয় সংকলন, দেশবাসীর প্রতি অগাধ প্রেম, আঞ্চলিক যুজনের মধ্যে কর্মে, খেলে-ভালবাসায় বিকশিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিভাব—এমন সবকিছু যখন অস্তিত্বের গোড়া থেকে একত্রে দিখিদিক টান মারে—তার সংগতিসাধন অত সহজ নয়। দৃঃসহ এই বয়সেই হয়ত তা পারা যায়। বুদ্ধের প্রতি সেদিন গাজী রহমানের অমনো-যৌগের হেতু এখানেই বৃক্ষ নিহিত।

“ভাবলাম”, বর্ণিয়ান বলে চলেন, “কেয়ামৎ নজদিগ। আর বাঁইচ্যান লাভ কী? তাগদ ছিল না কিছু, বা-জান্না, ওদের মুখ-বরাবর কিছু কই। মনে মনে আল্লারে ডাকি, হে আল্লা, ইমান খুয়াইয়া এমন বেইমান হওনের লাইগ্য। তুমি পাকিস্তান বানাইছিলে? জ্ঞায়ান কালে কতো খোওয়াব ঢাখছি, পাকিস্তান হইব, মানুষ হইতা পারব হগ্গলে। কতো খাড়ছি, ভোট দিছি। পাকিস্তান হইল। কতো রিফিউজী আইল। তাগোর জায়গা দিছি, খাওয়াইছি...হেরাও শুনি অহন মিলিটারীগো লগে। আল্লা... বেইমান হইয়া এই বয়সে মরণের লাই পাকিস্তান বানাইছিলাম?... আর কী কইমু বা-জান্না। বহু টাহাপয়সা পাইছে। তাল তাল সোনা। মিলিটারীগো ঢাখলাম বেজায় খুশ। আমাদের আর লগে নিল না। কইল—ভাগো...আপনা দেহাং যাও...। তয় রক্ষ। লুড়ের মাল দরিয়ার মন্দি হব ফেইলা দিছি। কিন্তু লুড় করছি হে ত আল্লা ঢাখছেন। শুনা মেঘনার পানিতে খোয়া যায় না...”

তারপরই বৃক্ষ পুনরায় বালকের মত ডুকরে কাঙ্গা শুরু করেছিলেন। এবার কেউ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে নিরুত্ত করতে এগোঁয়নি। “সকলেই স্তুক।

ঞ কান্না অসহায়তার আকস্মিক প্রকাশ নয়। বিস্তুক আস্থা বখন একের পর এক সব অবলম্বন ঠেলে ফেলে অস্থিতের ছায়ার জগ্নেই শেষ পর্যন্ত হংসে হয়ে ওঠে এবং নিমিষের প্রতারণাটুকু উপলক্ষির পর চিংকার দিতে থাকে—এই রোদন-নাদ তেমনই কিছু।

এক আওয়াজ সব যুথের কথা আস্ফাঙ্গ করে নিয়েছিল।

গাজী রহমান একবার সচকিত, আর কিছুই ঠাহর করতে পারেনি। সুদক্ষ গায়ক কর্তৃক রেখায়িত সুর যেমন এক পর্দায় থেকেও বাইরের বিচ্চির জগৎ টেনে আনে, গাজী রহমানের কাছে মনে হয়েছিল তেমনই একটা কিছু ঘটছে। কিন্তু কোন যুক্তির সাহায্যে সেদিন প্রবীণ শিক্ষক এমন সিদ্ধান্তে পৌছায়নি।

সখিনার সঙ্গে কথা শেষ হলেই গাজী রহমান যেন স্পষ্ট শুনতে পেত বৃন্দকঠের কান্ন।

নিজের অস্ত্রিতার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেওয়া অত সহজ নয়।

এই গ্রামে মিলিটারী আসবে। তার সম্ভাবনা কম। তবে অপম্বুজ যেখানে ভয়, সেখানে ছেশিয়ার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। খামোকা মরে লাভ নেই। মাঝে মাঝে অভিসচেতন মুহূর্তে গাজী রহমান তা স্টপলকি করেছে বৈকি। কিন্তু পরিত্রাণের আশায় হংসে হওয়া তার কাছে এক ধরনের কাপুরুষতা। কোটি কোটি নরনারী, শিশু কিশোর বৃক্ষ আছে না বাংলাদেশে? সকলে যদি শুধু নিরাপত্তার খোজে বিবাগী হয়, জালেমের মুখোয়াখি কে কখন উঠবে? অবিশ্বি সংসারে আবার সকলে যোদ্ধা নয়। তা হওয়াও অস্বচ্ছ। চাষী লাঙল ছেড়ে দিলে বিনা আহারে কী দিয়ে পরিলালা লড়বে? এই যুক্তি দিয়েছিলেন গাজী রহমানের এক বন্ধু, যিনি কমিশনার অফিসে বহুদিন বহাল থেকে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বাইরের জগতের হদিশ বোঝার জন্যে কখনও পেছ-পা হননি। অমন খাটি কথা গাজী রহমানকে বিচলিত করেছিল। সেদিন ছাত্রের প্রশ্নে হংসপ্রগতি

আচ্ছন্নতা কয়েকবার খেড়ে ফেলার চেষ্টা পেয়েছিল গাজী রহমান। অমন নির্জিবতা তো যত্নের সামিল। তারপর তার মনে হয়েছিল, নৈতিক যত্ন প্রতিদিন সে কৌভাবে সহ করবে? বাংলার প্রাণের কোনকালে কেউ এমনভাবে তো দৃষ্টি আবর্জনায় ঢেকে দিতে এগোয়নি!

বুদ্ধের কাঙ্গা এবার বার বার আছড়ে পড়ত তার হই কর্ণপটে অতি-প্রত্যক্ষ প্রাচীরভেদী বায়ুপ্রবাহের দুর্বার গতি-তোড়ে।

অনেকস্থল চুপচাপ হইজনে। শিক্ষক এবং সাবেক ছাত্র। হজনের ভাবনার এক জ্ঞানগায় মিল আছে। ইউনুফ ওস্তাদের নিরাপত্তার জন্য চিষ্টিত। শিক্ষক ভাবছেন, যদি এই বাড়ী বা গ্রামে সে ধরা পড়ে যায়, আশ্রয়দাতা এবং তার স্ত্রী উভয়ে লাখিতই হবে না শুধু, প্রাণও খোয়াতে পারে। গত একমাসে সামরিক জুল্মের নকশা সম্বন্ধে সে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল।

“ইউনুফ”—অনেকস্থলের স্তুতি হাটিয়ে গাজী রহমান উচ্চারণ করেছিল।

—স্ত্রাব!

—কিছু মনে করো না। খুব ভোরেই আমি তোমাদের গাঁ ছেড়ে যেতে চাই।

—স্ত্রাব, মনে করব বৈকি। আপনার সেবার নসীব আমার হল না।

—কেন? এই তো এক সপ্তাহ কাটালাম।

—স্ত্রাব। ওতে মন ভরে না। আপনার উপর ঝোর করতে ভরসা পাইনে। যদি কোন বিপদ আপনার হয়ে যায় এখানে ধাকার ফলে, তার চেয়ে আমার কাছে যত্ন হবে তের বেশী স্বর্খের। কিন্তু কোথায় যাবেন?

হঠাৎ পালটা প্রশ্ন করে বসেছিল ইউনুফ।

—তা ঠিক করিনি। তবে আমার অন্তে চিষ্টা করো না।

—স্ত্রাব, দুদিন আগে নেজামে ইসলাম, মুসলীম লীগের কেঁচোগুলো

কেঁচোই ছিল, ভুঁয়ে মুখ। এখন সেই কেঁচোগুলো কেউটে হয়ে
গেছে মিলিটারী বাবাদের জ্বারে। তাই ভয় পাচ্ছি। যদি ছোবল
মেরে বসে।

- অতৃষ্ণু বুদ্ধি আমার আছে, বিশ্বাস রেখো।
- কিন্তু আপনি আর আগের মানুষ নেই, তাই ভয়।
- বুকে যে অনেক যন্ত্রণা, ইউন্সুফ।
- কিন্তু কোন দরকার পড়লে খবর দেবেন।
- নিশ্চয়। সখিনা মা-কে একটু ডাকো। ওর সঙ্গে আমার
অনেক কথা আছে।

নদীর টলটলে জলের উপর ভাসতে হই চোখ লংশটে
ছড়িয়ে দিয়ে যদুর তাকাও; বাংলাদেশের আকাশ ছমড়ি খেয়ে পড়ে
আছে, একক বিধ্বতির মধ্যে গাছপালা পশ্চপাখী মানুষ প্রাণুর
টেনে এনে, এমন চিত্তপ্লাবী মোহনীয়তায়, মনে হবে, চরাচরের
স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত তোমার হৃদয় থেমে থেমে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায়
সব আঘাসাং করছে। এখানেও অতীয়মান বিচ্ছিন্নতা আছে।
কয়েকটা কালো জেলে নৌকার বহরের পর ঈষৎ শৃঙ্গতা শেষে একদল
ফিংগে পাখী সঞ্চরমান, আরো দূরে শুন্মু এক চিল্লতে লাল রং—যা
ভূক্তভোগী মাত্র জানে, অনেক দূরে ভাটিদেশমুখী কোন নৌকার
বাদামের পরিপ্রেক্ষিতবিলু, যদিও আকাশ আছে। কিন্তু আকাশও
তখন গায়ের হয়ে থায় এই নিমেষের লীলায়। নৌকার গতি দৃশ্যপট
বদলে দিতে থাকে প্রায় মন্টাজের কায়দায়। কিন্তু পাটাতনের উপর
শুয়েই থাকো বা বসে-বসে আঘাসীড়ায় বিব্রত হওয়ার চেষ্টা
পাও, রেহাই নেই তোমার অনিবচনীয়তার স্বাদপরিবেশন থেকে।
গুলিবিন্দু চারীকে দেখা গেছে নদীপথে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে
যাত্রাকালে, চোখে পরম প্রশাস্তির স্পর্শ, বাংলাদেশের এই প্রাণুর-
ভাণ্ডারের হাতছানিজালে বন্দী। ধৰনি এখানে রঙ। রঙ এখানে
ধৰনি। দোটানার ভেতর অবিশ্বাস্য সমাহারের তোড়ে আবর্তিত
আনন্দ এমন অস্তঃপ্রস্তাৱী যে, অতি-নেশার মত তা শেষে
সোয়াস্তিৱ হতে থাকে। আনন্দ-বেদনা তখন আবার সর্পমিথুনের
মত বৈত জোট বাঁধে। বিপরীতে-বিপরীতে জীবীর নিকট তুলনা
বাংলাদেশের নিসর্গশোভা। অকবি, অকবি অধিক হয়,
ৱ্রবাহুত, অজানিতে।



একটা খুব ছোট নৌকা গাজী রহমান ভাড়া করেছিল। ছ-ভাঁজ
চৈরের চাল।

বড় নৌকায় অনেকের সঙ্গে যাতায়াত বরং নদীপথে নিরাপদ।
চোর-ডাক্তাতের ভয় নয়। মিলিটারী স্প্যাডবোট হঠাৎ এসে পড়ে
খানাতলাসী শুল্ক করতে পারে। উদের ধারণা, এলাকা থেকে
এলাকা অন্ত চলাচল হচ্ছে দেশী নৌকা মারফত। এক
জায়গায় খড়-বোঝাই গোটা গহনায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল
একদল সৈন্য, শ্রেফ সন্দেহের বাশে। এত খড় আবার ডাঙায় ফেলে
খানাতলাসীর সময় কোথায়?

এমন ঘটনা গাজী রহমানের কাছে অপরিচিত কিছু নয়। সবই
তো নির্ভর করছে কিছু অল্পসংখ্যক লোকের মর্জিয়া উপর। তারা
ছাড়া আর কারো কোন অধিকার নেই। মোক্ষ কথা, এই যথন
পরিবেশ তখন সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু তা কোন নিরাপত্তার
জামিন নয়। সুতরাং ঝুঁকি যথন সব দিকেই, নিজেকে একা-একা
পাওয়া এবং বড় নৌকার ষেঁবার্বেঁষি ভিড় থেকে অস্তত রেহাই
মিলবে। এমন সব সাত-পাঁচ ভেবেছিল গাজী রহমান।

তোরে মজুর নৌকাধাটে আসতে তাকে পাঁচ মাইল
হাঁটতে হয়। এই পরিশ্রমের ফলেই সে যেন নিজেকে আবার
ফিরে পায়। জীবনের সঙ্গে পাঞ্চ লড়তে অভ্যন্ত, হঠাৎ কাবু হয়নি
কোনদিন সে। কিন্তু অকারণ অপমত্য এবং বর্তমান পরিস্থিতি-জাত
আকস্মিকতায় সে মনের বল হারিয়ে ফেলেছিল। তখন বিশেষতঃ
বিশাল প্রাস্তরের মধ্যে এই নদীপথ, জলো বাতাস, নানা দৃশ্যের
তামাশা ধৌরে ধৌরে ফিরিয়ে দিচ্ছিল যতো সাবেক তাগদ। এতদিনকার
আচ্ছান্তা যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। মাঝির সঙ্গে ছ-একটা কথা
অবিশ্বিত মাইলপোস্টের মত তাকে গন্তব্য-সচেতন রাখেছিল।

সাত-আট ঘণ্টা নৌকাপথে।

আর এক গ্রামে কিছুদিন অধিবাসের ইচ্ছা আছে গাজী
রহমানের।

নিজের বয়সের উপর বাঁর বাঁর ধীকার দেয় সে। কত কাজ এখন। আর তাকে বহু দিন স্কুলে যেতে হবে না। অবসর থাকলেও সে যেকাজ করতে চায় তার জগতে অন্ত বাতাস দরকার। এখানেও সে পারত যদি বয়স থাকত চলিশের নীচে। তাই তার পক্ষে স্কুল করা কঠিন, তার কর্তব্যের ক্ষেত্র কোথায় নিহিত। একদম পাকা যুক্তিবাদীর মত হঠাৎ গাজী রহমান সব দিক তলিয়ে দেখার চেষ্টা পাচ্ছিল। নিঃসঙ্গত তাকে আর পেয়ে বসে না।

বিপদের কথাও একবার ভাবলে সে। হঠাৎ মিলিটারী র'দের মুখে পড়লে ক্রিঙ্গাসাবাদে কী জবাব দেওয়া যায়। অতটুকু উপস্থিত বুদ্ধি আছে তার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার স্কুল নানা কাজে অগ্রণী ছিল। স্বতরাং প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তার বাঁচোয়া নেই। কিন্তু তাকে খুব পরিচিত লোক ছাড়া সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। একটা লুঙ্গি আর আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, পালিশহীন পুরাতন পাম্পু এবং গত এক মাসের আহারনিঝাঘটিত রগ্ড়ানি তার আদলই বদলে দিয়েছে। প্রয়োজন মত দৌড়ের জগতও সে প্রস্তুত।

জীবনে গাজী রহমান প্রথম উপজীবি করেছে প্রবীণ অস্থিমহঘোগে, মাঝুষের প্রয়োজনের সীমানা অনেক খাটো করা যায়। আর পার্থিব সম্পদের প্রতি মমতা—যখন অস্তিত্বের শিকড়েই টান পড়ে—মুহূর্তে উড়ে যায়। পঁচিশে মাটের পর সাতাশের সকালে গাজী রহমান লাখ লাখ মাঝুষকে শহর ছেড়ে যেতে দেখেছে। কেউ কেউ মাত্র এক বন্ধো। কত ধনীনদিনীকে সে দেখেছে খালি পায়ে ফুত হাঁটতে। হাতে চিরাভ্যস্ত ব্যাগটা পর্যন্ত নেই। আসবাব-সঞ্চিত শুরম্য ইমারৎ এক মুহূর্তে রাস্তার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, পলকে মূলাহীন। কত বাড়ীতে তালা দেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করেনি মালিকেরা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, সব সামগ্রীর যাচায়ের পদ্ধতি ঐমন বদলে যেতে পারে!

একবার মনে মনে হেসে উঠেছিল গাজী রহমান। গত এক মাসে প্রথম হাসি।

তার পার্থিব সম্পদের তালিকা এখন কোথায় দাঢ়িয়েছে? একটা টুথব্রাশ, পেস্ট। হ'চো লুঙ্গি। পাঞ্জামা, হেঁডা পিরহান, ছোট তোয়ালে। একটা বোলা ব্যাগ। বৈশকালে... সব আধেয়-সহ বালিশ। জয় বাংলা...। গেঁফে হাসি ছড়িয়ে সে বালকের মত প্রায় চীৎকার করে উঠছিল।

সহসা-নিহৃত, মনের ভেতর প্রতিধ্বনি কিন্তু গুপ্তরন তুললে বেশ কয়েকবার : জয় বাংলা।

নেহাত কোন মিলিটারী চেকপোস্ট পার হওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। সুষ্ঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারীদের ডয় পদে পদে। তারা হয় মুক্তিফৌজের সদস্য অথবা ভবিষ্যৎ দিনের স্বাধীনতার সৈনিক। তাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে সেই সময়কালে পরীক্ষকের মর্জির উপর। উত্তরপঞ্চাশে এমন কৃশ শরীর, তাই অপমৃত্যু থেকে কিছুটা রেহাই দেবে।

গাজী রহমান আজ সচেতনভাবে নিজেকে প্রশ্ন করলে, সে কি প্রাণভয়ে ভীত? অপমৃত্যুর ভয় না-থাকা হয় দুঃসাহস, নচেৎ মূর্খতা। সংসারের বিনা কাজে হঠাৎ জন্মের মত আয়ু খোয়ানো কাজো অভিষ্ঠেত নয়। একবারই যখন বাঁচা, তার সমাপ্তি অর্থবহ হওয়া—উচিত।

এই প্রথম ব্যাপারটার মুখোমুখি হল গাজী রহমান।

শীতলক্ষা নদীর এই এলাকায় হ'পারের গ্রামগুলো এখনও ভস্মীভূত হয়নি।

দৈনন্দিনতার জোয়ার টিরক্ষ বয়ে যাচ্ছে কী?

হৃষি ছেলের পাল কিন্তু কোথাও দার্পণাপি করছে না। হ'একজন বৃদ্ধা নদীর ঘাটে আসছে টা টা শহর থেকে ভের-চৌদ মাইল দূরে। এসব এলাকা কী তবে জনশূন্য হয়ে গেছে?

গাজী রহমানের ভয়ানক ইচ্ছা একবার সব দেখে আসে।

ডেমরা-ঘাটের চেকপোস্ট পার হওয়ার সময় তার বুক একবার কেঁপেছিল বৈকি। মৃত্যুর অনৃশ্য জিজ্ঞাসা এইভাবে আসে। স্বতন্ত্রঃ

ଆର ତୀରେ ନେମେ କାଜ ନେଇ । ହୋଟ ନୌକା ଏବଂ ନିରାଭଦ୍ର ଦେଖେ ମିଲିଟାରୀ ଚୌକିଦାର ଆର ଡାକ ଦେସନି । ତା କରିଲେ, ପ୍ରଥମ ଏକଟା ପରୀକ୍ଷା ହୟେ ଯେତ । ବେଗରୋଯା ତରଣେରୀ ଚେକପୋସ୍ଟ ଏଡ଼ିଯେ ଅନ୍ତ ପଥ ଧରେ । ଏକ ହିତାକାଙ୍କ୍ଷା ପଯପଯ ଗାଜୀ ରହମାନକେ ଉପଦେଶ ଦିଯେଛିଲ । ଆଜ ଏ ଭାବେ ବାରଣେର ପ୍ରତି ଅବହେଲା ଉଚିତ ହୟନି । ମୁକ୍ତିର ମତ ଯୃତ୍ୟାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାନା ପଥ ଧରେ ଆସେ । ଏକଚକ୍ର ହରିଣେର ଆବାଦିକ କାହିନୀର ଦୃଷ୍ଟି ନା ଆବାର ସଟେ ଯାଏ ।

ଛୁଯେର ତଳାୟ ବସେ, ଗାଜୀ ରହମାନ ଅନେକ କିଛୁ ଭାବଛିଲ । ଢାରୋଦ୍ଦୁର ଧାକାଯ ବାତାସ ଅତ ମନୋରମ ଲାଗଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ମେ ସେଚ୍ଛାୟ ଏକମାସ ଶରୀରକେ ନାନା କଷ୍ଟମହିଷୁତାର ମୁଖେ ସଂପେ ଦିଯେଇଛେ । ଶହରେ ପାଖାର ତଳାୟ ବସା ବା ଶୋଯା, ଯାନ୍ତିକ ସ୍ଵବିଧାଗତ ଆରୋ କତ ଆରାମ ନା ତାର ଆୟତ୍ତେର ମଧ୍ୟେ । ଏସବ ବିସର୍ଜନ ଦିତେ ତାର କୋନ କଷ୍ଟ ହୟନି । ବାଇରେ ବେଦନାର ଛ୍ୟାକା-ବ୍ୟାଗ୍ର ଫୋସ ଶତ ଶତ ଆବର୍ତ୍ତେ ଲକଳକ କରଇଛେ । ଏକଟି ଦେହ ତଥିର ଆର ଅତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଯ । ଅନ୍ତର ବ୍ୟଧାୟ କେଉ ଛିକ୍କାହୁନେ, ଆବାର ପ୍ରେମିକ ଭ୍ୟାନ ଗ'ର ମତ କେଉ ନିଜେର କାନ କେଟେ ପ୍ରିୟତମାକେ ଅଛିଲେ ଉପହାର ଦିତେ ପାରେ । ଡିଗ୍ରୀର ତାରତମ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ । ଗାଜୀ ରହମାନ ସେମେ ଉଠିଛିଲ । କିନ୍ତୁ କୁମାଳ ବା ତୋଯାଲେ ଦିଯେ ତା ମୋହାର ଚେଷ୍ଟା ଛିଲ ନା ଏତ୍ତକୁ । ଶରୀର ନାକି ମହା-ସୟ । ମେ ବେଶ କିଛୁ ଦିନ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିତେ ତୃପତି । ଯୃତ୍ୟାଙ୍କ ଫଳେ କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ଏସବ ବାମେଲା ଚୁକେ ଯାଏ । ସ୍ଵତରାଂ ଶାରୀରିକ ବିଡ଼ସନା-ସହେର ମଧ୍ୟେ ଜୀବନେର ସାଧନା ଆଛେ ବୈକି । ନଚେ ଆଗଭୀତ ସହେଓ ନିଜେକେ ମେ ଅତ ପ୍ରକ୍ଷତ କରିଛିଲ କେନ ? ଚିନ୍ତାର ଜଟ କ୍ରମଶ ନାନାଭାବେ ପାକ ଥାଏ । ପରିବେଶ ହୟତ ସେଦିନ ଗାଜୀ ରହମାନେର ପକ୍ଷେ ତା ସମ୍ଭବ କରେ ତୁଳେଛିଲ ।

ମାର୍ବି ଗତ ଚାର-ପାଞ୍ଚ ସନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ କେବଳ କ୍ରେକଟା ବିଡ଼ି ଫୁଁକେହେ । କଥା ମେ ଏକବାର ଜୀଇୟେ ରେଖେଛିଲ ପାଞ୍ଚ-ସାତ ମିନିଟେର ଜଣ୍ଠ । ତାରପର ତାର ଜାନାର ସବକିଛୁ ପ୍ରୋଜନ ବୋଥ ହୟ ଫୁରିଯେ ଗିଯେଛିଲ ।

মাঝির শুভতা কিন্তু কড়কটা বিঁধছিল খেঁচার মত। তার বহু বছরের জ্ঞানের বহু কলে পায়নি এই আম ব্যক্তির নিকট।

“সাব, একড়া কথা জিগামু?” খুব মোলায়েম ঘরে মাঝি প্রথম তার আচ্ছল্লতার গায়ে চুঁ মেরেছিল।

“অ্যা।” যেন সংবিধ নেওয়ার অঙ্গে চকিতে এমন এক শব্দের ব্যবহার-শেষে গাজী রহমান সাহস যুগিয়েছিল সহ্যাত্মীর মনে, “কি জিজেস করবে?”

—শেখ মুজিব কী অ্যারেস্ট অইছে?

ভাষার উপনিবেশবাদ অত সহজে যায় না। অবিশ্ব সাধারণ মানুষের মুখে বহু ইংরেজী শব্দ বহু দফা গাজী রহমান শুনতে অভ্যস্ত। আজ কিন্তু একটি বিদেশী শব্দ তার কানে অত সহজে অর্থবিস্তার করতে পারেনি। একটু সময় গিয়েছিলু।

“কাগজে তো তা-ই লিখেছে।” একদম সমানে সমান বরাবর, কোন শ্রেণীজ্ঞাত মূরৰ না রেখেই গাজী রহমান জবাব দিয়েছিল। মাঝির উপর তার শ্রদ্ধা আরোপিত কিছু নয়।

—ওই ছাপানো কাগজের কথায় আপনে বিশ্বাস রাখেন?

একটা তাছিল্যের হাসি কিন্তু জবাবের সঙ্গে লেপ্টে রইল।

মিহয়ে যেতে হয় গাজী রহমানকে। কিন্তু এই নিষ্পত্তি হঠাতে বিশ্বায়ের ধাক্কা। গত একমাস এমন নিখাদ স্বর সে আর কারো কাছ থেকে শোনেনি। শিক্ষিত জবাব দেয়, কিন্তু ক্ষুক। ধনী সম্পদ-হারানোর শোক কঢ়ে চেপে রাখার চেষ্টা পায়। রাজনৈতিক কর্মী প্রতিপক্ষের খুঁত দিয়ে গলার আওয়াজ ফাঁপা করে। ফলে নৌকার উপর গাজী গত কয়েক সপ্তাহের ড্রিয়মাণ্ডা এক নিমেষে হারিয়ে বসে না শুধু, নিজের স্বভাবত তেজ হঠাতে ফিরে পায়।

—তা ঠিগ। কিন্তু তুমি কী মনে করো?

—আমি জাহেল মানুষ, মুখখুঁ শুরুকু। আপনি কি মনে করেন—কন?

গাজী রহমান তখন সহজ ভাবেই সংবাদপত্রের প্রতিখনি

করে, “মনে হয়, শেখ মুজিব অ্যারেস্টেড—”

কিন্তু কথা শেষ করার স্থৰোগ পাওয় না গাজী রহমান। আবার সাবেক তাছিল্যের হাসি শোনা গেল, এবার আরো জ্বোর এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষের করণ ছবিটাই প্রকট।

—সাব, শেখ মুজিবের ধইরব কোন্ হালা। শেখ মুজিবের অ্যারেস্ট অইছে না। আমি কই হোনেন—।

গলা যথাসম্ভব শিক্ষকের দিকে বাড়িয়ে মাঝি তখন উচ্চারণ করেছিল, “শেখ মুজিব ফেরার। নানা বেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘূরতাছে। তাজ্জব, আপনে লিখাপড়া মাঝুষ এ খবর জানেন না ?”

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে এমন জবাব গাজী শুনেছে এমনই মাঝুমদের কাছ থেকে, যারা সাধুতা সরলতার সকল উৎস এখনও জীইয়ে রেখেছে। জীবনের জটিলতা এদের অত বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বহু শিক্ষিত মাঝুষের চেয়ে অনেক আগেই তারা গন্তব্যে পৌছায়। তাদের বিভ্রান্তি ও সরলতা-জাত। তাই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয় পৃথিবীতে।

ব্যক্তি নামে আবদ্ধ হয়। তাঁরপর সাধনায় ব্যক্তি হয় ভাবমূর্তি। আইডিয়া-কে কোন পশুশক্তি বন্দী করতে পারে ?

গাজী রহমানের আর কথা বলার সাহস হয়নি। তাঁর ইলেমের উপর কটাক্ষ নয়, তা সে বিরাট গৌরবের মত গায়ে মেঝে নিয়েছে।

গোটা বাংলাদেশের অভ্যন্তর অবলোকন করছিল গাজী। বাইরের এত শোভা—প্রাপ্তরশ্মে বিষণ্ণ তরুবীথি, হঠাতে মোচড়-মারা নদী বা খালের বাঁক, বালু-চিকচিক চর—কোন কিছুর উপর তার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল না। ভূতাঞ্চিকের মত বাংলাদেশের গহন তাঁকে তখন সবেগে টানছিল, মাঝির বাক্যপ্রতিবন্ধিনি যেখানে শিকলের মত নিঃশব্দে অনেক নীচে নেমে গেছে, তাঁর পায়ে বেড়ির আকারে প্রারম্ভিক অটুট রেখে।

আকাশে অকালে মেঘ জমছিল। উল্টো বাতাস উঠল।

ছোট নোকায় অনেক দেরী হয়ে যাবে ঘাটে পৌছতে। গাজী রহমান অবিশ্বিত গাঢ়াকা সক্ষ্যার অঙ্গে অস্ত ছিল। আরো দেরী হলে

নাচার। মাঝির এই এলাকার যাতায়াত বহু কাল থেকে। স্বতরাং তার জগ্নেও কোন চিন্তা নেই। বেশী রাত হয়ে গেলে গ্রাম এখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দালালের দল সক্রিয় ঘূরে বেড়ায়। কিছু না পারলে লুঠপাট করে। অবিশ্বিত তার মত বিবরণের জন্য বাটপাড় থেকে তেমন বিপদ আসবে না। টাকা একশ'র মত সঙ্গে আছে। তা পাম্পুর এমন কোটরে ঢুকে রয়েছে রঞ্জনরশ্মি পর্যন্ত থ' পাবে না। যদুর জানা আছে, এই এলাকা হানাদার বাহিনী থেকে নিরাপদ। ওদের বড় ধাঁটি বিশ মাইল দূরে। পাকা রাস্তা থাকার ফলে হঠাৎ হঠাৎ টহল দিতে বেরোয়। এমন বুঁকি তো বাংলাদেশে সর্বত্রই আছে। অত চিন্তা করলে ঘরে বসে তা দিতে হয়।

অবিশ্বিত প্রাকৃতিক ছুর্যোগের আশঙ্কা বেশীকরণ টিক্কল না। বাতাসের গতি বিরিবিরি পর্যায়ে। মেঘ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

একা মাঝি শুধু নৌকা বেয়ে চলেছে। নদীপথে বাত্তীর আনাগোনা খুবই কম। এই সময় শীতলক্ষা জমজমাট থাকে। এখন তুলনায় মনে হবে, নদী শুকিয়ে গেছে, আর কিছু নেই। নীরব হওয়ার দিকে যেন সর্বত্র সাধনা চলছে।

মাঝি যা চুপ করে গিয়েছিল, আর শুধু খোলেনি।

সঙ্গীতের আচ্ছন্নতার মত গাজী রহমান নিজের মধ্যে কিছু যেন অঙ্গুভব করছিল। চোখে ভীরবর্তী জীবনের সব খণ্ড-ছবির ছায়া এসে পড়ে। কিন্তু তার কোন অর্থবহু বিস্রণ গাজী রহমানের কাছে নেই। বস্তনাম সেখানে অঙ্গুপস্থিত। অনেক দূরে আকাশে একদল বকের বহর ভেসে চলেছে। অন্য সময় হলে গাজী রহমান ধাঢ় ঘুরিয়ে সব গতিবিধি দেখত। এমন কী পাখির সংখ্যা গোনার মত বালকের চিত্ত নেশায় মেতে উঠত। আজ সে যেন কিছুই দেখলে না। এক-এক বার স্তুকতা পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে যায়।

খেঁয়ারি আসে গাজী রহমানের ছাই চোখে। সে তো গত এক মাস ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে ঝান্সির টানে টানে ছাই চোখ বুঁজে সে পড়ে ধাকত। আন্ত পেশী বিশ্রামের স্পর্শ-প্রার্থী। কিন্তু চোখের

মধ্যে বীভৎস দৃশ্য তখন দাপাদাপি করছে। মন তজ্জুপ লণ্ডণগুঠিক পেশীর উল্টো দিকে ধাইতে চায়। এই টানাটানির চোটে আর যাই হোক তন্ত্রভাব সম্ভবত থাকে, কিন্তু ঘূম ধরে না। সাপের বিষে ক্রমশ অঘোর ব্যক্তির নাকি এমন দশা হয়, যদিও তার পক্ষে তখন ঘূম মানে ঘৃঙ্খ। গাজী রহমানের তেমন বালাই ছিল না। আমুক না ঘৃঙ্খের মত ঘূম। তার কাছে আর কোন উন্নত অঞ্চল এখন অজ্ঞাত। বিভৌবিকার হাত থেকে রেহাই পেতে আর কী প্রার্থনা করা যায়?...পায়ের ছাঁটো মলির উপর কয়েকটা কাটামুণ্ডু, খোলা এবং তাজা চোখসহ ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল আরো কয়েকটা লাশের স্ক্রপের দিকে, যেখানে পাঁচটি জ্যান্ত কচি শিশু বুকে হাত রেখে একদম ভ্যাবাচাকা চেয়ে আছে বেড়া দেওয়া একটা বিরাট খাদের ধারে। প্রথমে তা-ই মনে হয়। বুরি বেড়ার খুঁটি। চোখ কচ্ছানোর পর সংযত দৃষ্টি জানান দেয় ওগুলো মাঝুবের হাত, সারি সারি অনেক দূর বিস্তৃত। খড়হীন হাত। ক্ষোভ, প্রতিবাদ, ঘণা, অসহায়তা আঙুলের অবস্থানভঙ্গী থেকে উদ্বার করা কঠিন। মানব-গোষ্ঠী অথবা আকাশের মুখে লাধি-মারার প্রচেষ্টারত উলঙ্গ রমণীর হই উর্বরমূখী পায়ের মাঝখানে বেয়নটের খেঁচা থেকে টাটকা রক্ষ করছে, আর তা মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে একদল কুকুর। চাপ-চাপ কালো সীমার ভাস্কর্য কয়েক ফুট জুড়ে, এবড়ো-খেবড়ো জমিন, যার উচ্চতা তরতম দশ ইঞ্চি। ভাস্কর্য নয়। আসন্ন ঘৃঙ্খের মুখে পাঁচসাত জন, গোটা পরিবার জড়াজড়ি এক আলিঙ্গনে পার্থিব জীবনের সব স্বাদ মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল, যখন আগুন এবং গুলির আঘাত তাদের নিমেষে স্তুক এবং পরে দাহকার্য সমাপ্ত করেছে। মুসলমান পরিবার। কিন্তু হিন্দুর মত শেষকৃত্য পেয়ে গেছে ইসলামী রাষ্ট্রে। কারণ, সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ তার। চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। তাই শাস্তি, এই চরম শাস্তি। এমন কত বিভৌবিকাময়ী ছবি। মাঝুবের খণ্ড খণ্ড কুঁচি যেন জ্যোতিরিঙ্গ-বাহিনীর যায়াবরপনার মত বাংলাদেশের চারিভিত্তে উড়ে

উড়ে বেড়াচ্ছে। চোখের অংশ, হাত-পায়ের খণ্ড, স্তন-উকুল ভাগ, বুকের টুকুরো...। তাই চোখের রেহাই নেই। ঘূম কী করে আসবে?

নৌকার হলুনি। তবু জননী ক্রোড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে গিয়েছিল গাজী রহমানের, হয়ত ঘূম আসত। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সে। কারণ, আর এক বিভীষিকার মিছিলের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে হঠাৎ দোড় দিয়েছিল উর্ধবাস। ঘাম দিয়ে খেঁয়ারি ভেঙেছে। স্মৃতরাং আর শোয়ার ধারেকাছে থাকতে সে নারাজ।

বাইরে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রহমান শীতলক্ষার পানি আঁজলা-আঁজলা পান করার পর চোখে-মুখে ছিটোতে লাগল। কিছুটা মাথায় পর্যন্ত দিলে, বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। পূর্বে বহু রাত্রি ভয়ে ঘুমোয় নি সে। বরং বসে থাকা ভাল। তন্মাচ্ছন্নতা কৃত ভয়াবহ হতে পারে তা সে জানে।

জলো বাতাস এবং পানির সিঞ্চন মারফত বেশ সোয়াস্তি অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেদিন গাজী রহমান। বালকের মত আঙুল ডুবিয়ে রাখলে কক্ষণ, নৌকার গতির সঙ্গে সমান্তরাল। এই স্বড়স্বড়ি অনেক শাস্তির প্রলেপের মত মনে হলো। পা নদীতে ডুবিয়ে রাখলে কিছুক্ষণ। তাপহর এমন সব স্পর্শে অস্ত্রিতা কিছুটা কমে। একটু আগে মাঝির সঙ্গে কথাবার্তায় কী স্থখের সঙ্কান না সে পেয়েছিল। এখন কিছু নেই। আবার চারদিক থেকে চারখানা পাঁচিল যেন এগিয়ে আসছে তাকে ঠেসে ধরতে। নদীর পানিতে ঝপঝপ শব্দে জোরে জোরে পা ধূতে লাগল গাজী রহমান। শরীরের এই নড়াচড়া যদি সাহায্য করে। অত্যাশা অনেকখানি পূর্ণ হলো।

গাজী রহমান তীব্রবর্তী জীবনধারার দিকে আবার আক্ষুষ্ট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক জিনিস দেখতে লাগল। উচু ভিটের উপর থেকে সরু রাস্তা নেমে এসেছে নদীর ঘাট পর্যন্ত। তার সাদাটে রেখার আঁকবাক ছ'পাশের সবুজ গুল্মতার আবেষ্টনীর মধ্যে শুধু রং-মাহাঞ্জো চোখের কাছে জানান দিতে থাকে। ছ'টো

ଶାଂଟୋ ଶିକ୍ଷା ଦୀନିଯେ ଆହେ ଏକଟା ସରେ ପେଛନ ଦିକେ । ବୁଡ଼ୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ମୁଖେ ଗୁଞ୍ଜେ ହୁଅନେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାରେର ଛଇଶେଲ ବାଜାବେ । ଏହି କୃଷକପଣ୍ଡୀର ଅବଶ୍ଵାନ ଦେଖେ ମନେ ହୟ ନା, କେଉଁ କୋଥାଓ ସରେ ଗେହେ । ବେଳୀ ବୋପରାଡ଼ ନେଇ ଯେ, ବିପଦେର ଦିନେ କୋନରକମେ ଓରା ଆଡ଼ାଳ ହତେ ପାରେ । ଧାଟେ ନୌକା ବୀଧା ଚାର-ପାଂଚଖାନା । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଡିବୋଟେର କାହେ ଏସବ ଖେଳନା ମାତ୍ର । ଧାନ୍ୟା କରଲେ ଆର ରେହାଇ ଥାକବେ ନା । ଜାନେର ଡର ସକଳେର ଆହେ । କାଜେଇ ଖଦେର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥାମୋକା । ଯୁକ୍ତିର ଥେଇ ଧରତେ ପାରାର ଫଳେ ଗାଜୀ ରହମାନ କ୍ରମଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥେକେ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ୍ତରେ ସେତେ ସକ୍ଷମ ହୟ । ଅନ୍ତତ ବିଭୌବିକାର ଉଂପାତ ଗରହାଜିର । ଏତ ଜ୍ୟାନ୍ତ ଛବି ଚୋଥେର ସମ୍ମୁଖେ । ତାଦେର ଭୁଲୁମ ଅତ କଠିନ ନଯ । ଯୁତ ଛବିର ଟୁକ୍ରୋ-ଟାକ୍ରା ତୋ ନିଗରେର ମଇ ଚାଲିଯେ ଯାଯା । ମାଝେ ମାଝେ ତାର କ୍ରତତା ଏମନ ବାଡ଼େ ଯେ ଦିଶପାଶ, କିଛୁଇ ଆର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୟ ନା, ଅଥଚ ହର୍ଭୋଗେର ଗତି ଅକୁଣ୍ଠ ଅବ୍ୟାହତ ଥାକେ । ଏହି ଜନ୍ମେଇ ବୋଧ ହୟ ପ୍ରେତେର ଏତ ଭୟ ଛନିଯାମୟ । ଜ୍ୟାନ୍ତ ମାନୁଷ ହାନିକାଳେର ଗନ୍ତୀତେ ପଡ଼େ, ମେଥାନେ ଯୁତାଞ୍ଚା ଲାପରୋଯା ବା ବେପରୋଯା ।

ତିନ-ଚାରଟେ କୁକୁର ଗାଜୀ ରହମାନେର ନୌକା ଦେଖେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଥିଲେ ଡାକତେ ଲାଗଲ । ଏକେଇ କାଙ୍ଗା ବଲେ ସାଧାରଣଭାବେ । ଢାକା ଶହରେ ସଞ୍ଚୟାର ପର ଆଜିଓ କୁକୁରଗୁଲୋ ଅନ୍ୟ ଧରଣେର ଡାକ ଯେନ ଭୁଲେ ଗେହେ । ଉ-ଉ-ଉ-ରବ ଏକଟୁ ଉଠେ, ତାରପର ଖାଦେ ନେମେ ଆବାର ଯେ ଏକ-ଟାନା ଚଲତେ ଥାକେ, ତା ଶେଷ ନା ହେଁଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵରଗ୍ରାମେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ଥାକେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ଵାଭାବିକତା ସମ୍ପର୍କେ କୁକୁରେର ବୋଧ ଆହେ, ଅଥଚ ପାଞ୍ଜାବୀ ଅଫିସାର ଆର ତାଦେର ଚାମୁଣ୍ଡ-ଦଲ ଏକଦମ ଅଞ୍ଜାନ । ହୟତ ଗୁଲୋ କୁକୁରେର ଚେଯେଓ କୋନ ନୀଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଜୀବ ।

ଗାଜୀ ରହମାନ ଏହି ଚିନ୍ତାର ପର ଅବିଶ୍ଵି ଲଜ୍ଜିତ ହୟ । ଆକୈଶୋର ରବୀନ୍ଦ୍ରବିଲାସୀର କାଳେ ବାଡ଼ି ମାରେ, ‘ମହୁଞ୍ଜବେ ବିଶ୍ଵାସ ହାରାନୋ ପାପ’, ଏବଂ ତା ଖୋଯାଲେଇ ଗୋଟା ଦେଶର ମାନୁଷ ସମ୍ପର୍କେ ଅମନ ଭାବା ଯାଯା । କିନ୍ତୁ ମେଦିନ ମନେର ମୁଖେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗାମ ଦିତେ ପାରେନି ଗାଜୀ ରହମାନ । ନୃଂସତାର ଛବିଗୁଲୋ ଆବାର ହଞ୍ଚେ ବିଭୌବିକାର ରୂପ

নিতে পারে, এই আশকায় সে বরং কুকুরদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল। নেহাত জানোয়ারের দল, আবহাওয়া দূর্বিত করলে কয়েকবার ককিয়ে, তারপর এক ছুট দিলে মাঠের দিকে।

এইখানে নদীর পাড় সমতল। বেলেমাটি ঝুরঝুর ভেঙে ভেঙে পড়ছে টেউয়ের আঘাতে। পাথিদের গর্ত আয়গায় জাঙগায় কালো কালো গোল দাগের আভাস স্ফটি করেছে। বাইরের দিকে মন ছুটে গেলে হাজার চক্ষুতার মধ্যে একটা প্রশাস্তির ভেলা পাওয়া যায়। নিজের তোলপাড় আবেগের কথা ভুলতে বসেছিল গাজী রহমান। সত্যি বিশ্বতির নিপট অঙ্ককার খেয়ে এল যখন সে দেখলে, বারোয়ারী অশথ গাছের নীচে একজন প্রৌঢ়া মহিলা এবং দশ-বারো বছরের একটি ছেলে দাঢ়িয়ে আছে। সব নিরীক্ষণের আগেই মহিলা ডাক দিলে, “ও মাঝি, বা-বাজান—”

গাজী রহমান চোখ ফিরিয়েছে মাঝির দিকে। সে জবাব দিতে দেরি করেনি, “কি বুজ্জান?”

গ্রামাঞ্চলে সম্পর্ক এমন ছড়ানো থাকে। আকস্মিক যোগসূত্র কাউকে লজ্জা দেয় না।

“আমাদের একজু নিতা পারবা, বা-জী?” প্রৌঢ়া শুধায়।

—যাবেন কই?

—মরিচাখালি।

নৌকার মালিক তো আর মাঝি নয়। ইতস্তত করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, ছকুম নিতে হয়। মালিকের দিকে তাকানোর সময়ও তাকে ক্ষেপ করতে হয় না, যথা-জবাব উচ্চারিত হয়ে গেল, “আইতা পারেন। মাঝি, নৌকা লাগাও।”

ছোট নৌকা। ছ’জন আরোহী বাড়ল। মাঝি গাইগুই করতে পারত মেহনতের কথা ভেবে। হাওয়ায় আর আরামের ঘূঢ়ি ওড়ে না। বুটের ঠোকরে ধেঁতলে গেছে বাংলাদেশ। তার চেয়ে কষ্টদায়ক বোঝা আর কি আছে কোথাও?

এবার নিরীক্ষণের স্বয়েগ পায় গাজী রহমান। প্রৌঢ়া মহিলা

শহরে আয়া বা রাঁধুনি শ্রেণীর। ঢাকা শহরে এদের বলা হয় মাতারি। বয়স হয়ত চলিশ-বিয়ালিশ। বেতরীবৎ মেহনত আযুক্ত বাড়িয়ে দেয়। তাই বেশ প্রৌঢ় দেখায় মাতারিকে। সঙ্গে বালক পুত্র। মাতারির হাতে একটি ছোট গাঁঠরী, এক হাতে জগ্নি। পুত্রের হাতে শুধু একটা তারের ধৰ্ম। ভেতবে এক হালি (গণ্ড) সাদা বিলেতী ইছুর হৈচে জুড়েছে। পরিধানে হাফপ্যান্ট, অয়লা হাফশার্ট। ছেলেটাকে কিন্তু বেশ তেজী দেখায়। মা-ছেলে অনেক অপথ ধরে বছক্ষণ হেঁটেছে, তা তাদের ইঁটু-তকু কাদা এবং মুখের ঘাম দেখলে বুঝতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। খেত গিনিপিগগুলোর দিকে চোখ পড়তে গাজী রহমানের কেন জানি ইষৎ হাসি পেয়ে যায়। অবিশ্বিক কিশোর বা তরুণদের খেয়ালিপনা প্রৌঢ়দের কাছ থেকে করণা বা ব্যঙ্গ লাভ করে। গাজী রহমানের হাসি স্বতঃফুর্ত। অবিশ্বিক পরমুহূর্তে তার মনে হয়, পথআমে হইজনে নাজেহাল অথচ আর একটা বোৰা বাড়িয়েছে খামোকা।

বড় সঙ্কোচের সঙ্গে পায়ের কাদা ধূয়ে মা-ছেলে নৌকায় উঠল। বড় প্রিয়মাণ প্রৌঢ়া মহিলা।^১ মুখের ঘোমটা কিছু বাড়িয়ে দেয়। অথচ এতক্ষণ পর্দার কোন বালাই ছিল না তাব। মেহনতী মেয়েদের কাছে সামাজিক অনুশাসন এইভাবে ঢিলে হয়ে যায়।

গাজী রহমানের চোখ বার বার মুষিককুলের উপর গিয়ে পড়ে। সদা-ভীত এমন প্রাণী আব দ্বিতীয় নেই ছনিয়ায়। তাই বিহুল চোখ আর গোফ সদা-কম্পমান। গোটা বাংলাদেশকে গিনিপিগ বানানোর পৃত সাধনায় মন্ত হানাদার সৈন্যবাহিনী। এই চিন্তা হঠাতে প্রৌঢ় শিক্ষককে আচ্ছন্ন করে ফেললে। আবার মনের ভার বেড়ে যেতে পাবে, আশঙ্কিত হয় গাজী রহমান। এসব এড়াতে সে বালকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে যথারীতি কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর।

“তোমার নাম কালু। কেমন?” অশ্ব গাজী রহমানের।

“জী । ভাল নাম, মহম্মদ ইউসেফ ।” সংকোচিত এমন জবাবে
বিছালরের বর্ষাগ্রান পরিচালক খুব খুশী হয় ।

—বাপ বেঁচে আছে ?

গাজী রহমানের এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে বালকের মুখ অবনত,
তড়িঘড়ি আর সে জবাব দিতে পারে না ।

গাজী রহমান বুঝতে পারে, পিতা মৃত । কিন্তু ফালু যে মুখ
নৌচু করেছে আর তুলছে না । বিশ্বিত শিক্ষক বালকের মুখাবয়ৰ
এবার বেশ খুঁটিয়ে দেখেন । পানি ঝরছে দুই গাল বেয়ে । মনে
মনে অশুভত্ব হয় গাজী রহমান । এমন পুরাতন ঘায়ে থোঁচা দেওয়া
উচিত হয়নি । কঢ়ি বালক । অথচ মৃত্যুও এই বয়সে মাটিতে তার
মুখ ধূঁড়ে দিয়েছে । বালকের অগুদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত
কোন চিজ, যথা টকি বা ঐ জাতীয় কিছু সঙ্গে নেই । একটা গুমোট
সৃষ্টি হয় এবার এখানকার সম্পর্করাজ্য ।

হয়ত মরিচাখালি পর্যন্ত এই মৌন অব্যাহত ধাকত । কিন্তু
মাতারি ঘোমটার প্রস্থ কমিয়ে তখন পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ অভয়
দান করে ।

—ফালু, উনারে ক' না, ব্যাড়া । বা-জানরে আল্লায় নিছে না,
মিলিটারী নিছে ।

মাতারির কঠে সজলতার আভাস তার দৃষ্টির বিকল্প ।

জননী আরো কিছু ঘোগ দিলে পুত্রের মুহূর্মানতা বেঁটিয়ে ফেলতে ।
কিন্তু ফালু শুধু নিঃশব্দে কাঁদে । তখন মাতারি নিজেই এগিয়ে
এল । শুধু প্রাথমিক সঙ্কোচের বেড়া ছিল এতক্ষণ বাধা । নচেৎ
সেও কম বাক্পটু নয় । এবাব ঘোগাঘোগ সোজাস্বজি ।
মাবধানে পুত্রের ঠেস অন্তর্হিত ।

—মিলিটারী নিছে ?

গাজী রহমান বেড়া ভেঙে দিতে আরো তৎপর ।

—হ, মিয়াভাই । আল্লায় নিলে তো ‘দিলে’ বুঝ দিতাম, যার
মাল হেই নিছে । নিল শয়তান মান্যে ।

গাজী রহমানকে আর কোন প্রশ্ন করতে হয় না। মাতারি গটগট বলে যায়, তাদের বস্তি কিভাবে মিলিটারীরা আগুন লাগানোর পর গুলি করে করে মারতে লাগল, যাদের সামনে পেলে। মা-ছেলে কোন রকমে নিষ্ক্রিয় পেয়েছে। তারপরও একমাস ঢাকায় কাটিয়ে এখন গ্রামে ফিরছে ছইজন। ছেলেটা বাপের বড় শ্বাওটা ছিল, তাই স্থূতির ধাকায় অমন মৃত্যু ঘেটে।

মাতারির ঘোষটা আর বহাল নেই। গাজী রহমান প্রাচীন শিক্ষকের মত পরন্তুর দিকে তাকাতে অনভ্যস্ত, তবু চোখে চোখ পড়ে গেল। নসীবের কাছে পয়ঝার শত খেলেও এই রমণী জীবনের মোকাবিলায় সক্ষম। বয়ান-কালে তার কষ্টে কষ্টে কোন জড়তা ছিল না। কিন্তু কথা শেষে সেও হঠাত ফুঁপিয়ে উঠল এবং পুত্রকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু খেতে লাগল।

গাজী রহমান অসোয়াস্তির মুখে আর ধরা দিতে নারাজ। ফালুর সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্কধারা আবার চালু করার পক্ষপাতী। নচেৎ মনের অলুশোচনা যাবে না। সেও তাই ফালুর পিঠে সন্নেহে হাত বুলাতে লাগল।

আদরের এই আতিশয্য হয়ত বালকমনের টেউ ধাত-মত ফিরিয়ে আনলে। মা'র উপর সে ঈষৎ তেতে ওঠে, “তুমি কইলে না ক্যান মা, বা-জান আমাগো ধাকা দিয়া পাশে ঠেইলা দিছল হালা খানকীর পুত্রেরা যহন গুলি ছোঁড়ে। তাই বাজান মইয়া গেলেন, আঁরা বাঁচলাম। আমিও হালাদের গুলি করয়।”

পুত্রের এই কুৎসিত গালি এবং আশ্পর্ধায় শক্তি মা হঠাত পুত্রের মুখ চেপে ধরে।

স্বাভাবিক হাওয়া বইছে। এই কাঁকে গাজী রহমান তার হাত সরিয়ে নিয়েছিল।

নিষেধের স্বরে মাতারি বলে যায়, “অমন কভা কইতে নাই।”

—কইতে নাই, তোমারে লাটসাবে কইছে!

বেশ তাচ্ছিল্যের স্বরেই সে আরো ঘোগ করে, “হালারা বা-

জানরে মাইরব, আমাৰ হে কথা কওয়াও নিষেধ? খোন আপনেৱ
লাটসাৰ।”

—চুপ, চুপ।

“চুপ কৱমু ক্যান? হিতালাই (সেইজন্ত) ভাইজান, তোমাৰে
না কইয়া ভাগছে।” পাণ্টা দিতে দেৱি কৱলে না দুৰস্ত বালক।

মাতাৰি এবাৰ শুধু স্তৰ হয়ে গেল না, মুখ ভাৱ কৱে ছেলেকে
এক পাশে সৱিয়ে দিলৈ। অৰ্থাৎ সেও কম বিকুল নয়।

সম্পৰ্কেৱ ত্ৰিভুজে বিশ্বিত গাজী রহমান আবাৰ স্বাভাৱিকতা
ফিরিয়ে আনাৰ পক্ষপাতী। সে সোজাসুজি মাতাৱিকে এমন
সহসা-স্তৰতাৰ হেতু জিজেস কৱে।

প্ৰৌঢ়াৰ মুখজৰানি জানা গেল আৱো হদিস। স্বামী দিন-মভূৰ
খাটট। স্ত্ৰী মাতাৰি। কিন্তু গ্ৰামে সতৰ-আঁষ্টাৰ বছৱেৱ এক
জোওয়ান ছেলে ছিল তাৰ। বিধা হই জমি এখনও তাদেৱ আছে।
প্ৰৌঢ় স্বামীৰ পক্ষে চাৰবাসেৱ তদাৰকি, লাঙলধৰা বেশ কষ্টসাধ্য
ছিল। তাই গ্ৰামেৱ ভাৱ ছিল জ্যোষ্ঠ পুত্ৰেৱ উপৱ। ঢাকা শহৱে
সে পিতামাতাৰ খোজ নিতে এসেছিল মিলিটাৰী হামলাৰ সাতদিন
পৱে। পিতাৰ মৃত্যু এবং বহু মৃত্যুকাৰিনীৰ সঙ্গে তখন তাৰ পৱিচয়
ঘটে। বড় ছেলেৰ সঙ্গে মাতাৰি চলে আসতে পাৱেনি। কাৰণ
বেতন বাকী পড়ে আছে। তত্পৰি হঠাৎ গৃহস্বামীকে অনুবিধায়
ফেলে আসা তাৰ কাছে সমীচীন ঠেকেনি। কিন্তু কাল এক
গ্ৰামবাসী খবৱ দিয়ে গেছে গত পনৱ দিন তাৰ ছেলে ঘৰে নেই।
সে মুক্তিকোজে যোগদানেৱ জন্যই বাড়ি ছেড়েছে। ছেলেৰ বন্ধুদেৱ
মুখ থেকেই পৱে ঘটনাটা প্ৰকাশ পায়। তাই শহৱ থেকে তাৰা
গ্ৰামে ফিৱছে।

গাজী রহমানেৱ কিছু বলাৰ থাকে না। তাৰ বিশ্বয় কেটে
বায় অবিশ্বি। কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায়, এই হংস্ত পৱিবারেৱ দেখাৰ
মত আৱ লোক নেই। দশ-এগাবো বছৱেৱ বালকও চাষে খাটাৰ
অযোগ্য। তবু সামৰনা দিতে হয়।

—ভাবড়ান না। জ্বোওয়ান ছেলে হয়ত ঘরেই আছে।

—না, ভাইজান। হে-ও এড়ার মত হাঁইঢ়া (হাঁদে)। দাঁদ (প্রতিশেখ) নিতা যাইতা পারে। মুক্তিফোঁজের কাম ত বালা (ভাল)।

এই অবোধ জননীকে কি বা জবাব দেবে গাজী রহমান? তাই নির্বিকার কষ্টে উচ্চারণ করে, “হ, বু-জান। বা’লা কাম!”

মাতারি আশ্বস্ত হয়। ফালুর চোখ তখন তার পোষা ইঁহুরের দিকে। আকাশে মেঘ কেটে আবার ঢ়া রোদ বেরিয়েছে। গরমে হাঁপাছিল প্রাণীগুলো।

ফালু এবার আবার নিজের স্বরূপে ফিরে গেছে। বিনা সঙ্কোচে সে গাজী রহমানকে শুধায়, “সাব আমার একড়া উপকার কইবেন?”

শিক্ষক দ্বিধাবিত। কিশোরের মুখে কথাগুলো বড় পাকা-পাকা শোনায়। তবু ঠোঁটে যত্থ হাসিয়োগেই সে অভয়দান করে, “কি কও!”

—আমার ইঁহুরগুলান আপনের ছায়ায় রাখ্যু?

এতক্ষণ সেদিকে গাজী রহমানের খেয়াল ছিল না বিধায় সে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়। শুধু প্রাণী কেন, ওদেরও সে ভেতরে জায়গা দিতে পারত। আর একটু পরে মা-ছেলে নেমে যাবে। আর এক আওড় মাত্র। এখন আর আমন্ত্রণ দিয়ে ওদের অপমান করা উচিত হবে না। মুক ইঁহুরগুলো অন্তত ছায়ায় বিশ্রাম পাক।

থাঁচার মধ্যে একটি মাটির পেয়ালা বসানো। ফালু তা বের করে পানি-বোৰাই দিলে। পিপাসু ইঁহুরগুলোর জলপান দেখায় ব্যস্ত থাকে সে। মাতারি তখন তার পথে-পাতানো অগ্রজের সঙ্গে কথা বলে।

—ভাইজান, অবলা প্রাণী। ভাবলাম থুইয়া আসি। কিন্তু ভাবলাম, এগুলার কেউ যত্ন নিব না। বেগের খাওয়া মইৱা যাইব। জান হগ্গলের সমান।

“মা, খাঁচা বইতে আমার জান্ থায় গা। তবু ইছুর রাইখ্যা
আসতাম না।” ছেলে মাঝখানে ফুট কেটে বসল। মা সেদিকে
জঙ্গেপ করে না।

—কালুও তাই কইছিল। বেগৰ খানা মইয়া যাইব।

খাঁচার মধ্যে তৃপ্তি মূষিকবৃন্দ তখন বেশ ছুটোছুটি করতে লেগে
গেছে। মা-ছেলের কথা আর শেষ হয় না। ইছুরগুলো তাদের
ফেলে আসতে হয়নি, সেই সামনার আশাসই বার বার ধাই মারে।
মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের স্মরণ, হোক ক্ষুজ্জি প্রাণী, কী কম
সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মহামারী মৃত্যুর মুহূর্তে প্রসর মুখ-গহ্বরের নীচে কয়েকটি
জীবের প্রাণ বাঁচানোর ওই সংকল্প, গাজী রহমানের কাছে মনে হয়,
বিরাট কৌতুক, তামাশা। কিন্তু পরক্ষণেই সে রিজেকে শুধরে নেয়
এবং আজ্ঞ-সম্মোধনে মগ্ন অশুট উচ্চারণ করে—

“বাংলাৰ মুখ আমি দেখিয়াছি...”

কান ছাড়া করলেন রেঙ্গা আলি ।

উত্তরপঞ্চাশে তার ঘূম করে গেছে । প্রবীণ উকীল মামলার নিরিখ শেষ করে বিছানায় যেতে যেতে ধারোটা বেজে যায় । আজকাল অবিষ্টি সে-বালাই নেই । কোট-কাচারি প্রায় বদ্ধ । শ্বশানপ্রহরীরা দু'চারজন শুধু হাজিরা দেয় । তবু ঘুমাতে পারেননি তিনি । গত হল্পা থেকে নিজাহিনতা আরো বেড়েছে । বাইরে থেকে শব্দ এলে উৎকর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না । কারণ শব্দভেদী বাণের প্রাচুর্যে এখন বাংলাদেশ পৌরাণিক যুগকে ছাড়িয়ে গেছে ।

ঠক্ক-ক ঠক্ক... ।

মফস্বল শহর এত রাত্রে নিঃশব্দ হয়ে যেত বহুকাল থেকেই । আজকাল এখানে দিনরাত্রির ফারাক নেই । দুপুরেও গা-ছমছম করে । প্রথমে পাকবাহিনী এক নাগাড় বোমাবর্ষণ মারফত গোটা শহরটা ছারখার করে দিয়েছিল । তারপর আসে সাক্ষাৎ হামলা । শহরে একটা প্রাণী ছিল না । একমাসে কিছু কিছু লোক ফিরে এসেছে নিতান্ত দায়ে ঠেকে অথবা ঘরবাড়ির হাল-হকিকৎ নিতে । সিপাইদের কিছু স্থানীয় সহচর অবিষ্টি বহাল তবিয়ৎ আছে, ঠাট্টের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটে । তারা এসেছে ইহকাল এবং পাকিস্তানকে গুহিয়ে দিতে । একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল পবিত্র ইসলামের মন্ত্র ফুঁকে । তা ধৰ্মস হয়ে যেতে দেওয়া যায় না ! পরকালে আঞ্চার কাছে জবাব দিতে তো হবে । তাই কত্ত্বে আ'মের পর কত্ত্বে খাসে তারা কিছু কিছু সাহায্য করছে । সঙ্গে লুঠতরাজ, ফরজের (অবগুপ্তালনীয় শাস্ত্রীয় কর্তব্য) সঙ্গে ওয়াজেরের (যা বাধ্যতামূলক

নয়, শান্তীয়ভাবে) মত। যুদ্ধক্ষেত্রে লুঠ·বলে কিছু ধাকে না।
অস্তত মধ্যবুগের আরবে তা ছিল না।

শহরের স্তুতা প্রেতপুরীর মত। এখানে আর যা-ই হোক, বাস
করা অস্ততব। রেজা আলি এক বিখ্যন্ত চাকরকে নিয়ে শহরে কেন
এসেছিলেন বলতে পারবেন না। রাজনীতির বহু দূরে থাকতেন
তিনি। তার রাজনীতিবিদ্ বক্তুর অবিশ্বিত অভাব ছিল না। কিন্তু
আশ্চর্য, মুসলিম লীগার দেখলে, তার কাছে মনে হতো, সে একটা
সাপ দেখেছে। যৌবনে শ্রেফ নজরুল এবং রবীন্নাথের আওতায়
গড়ে-ওঠা মন। কিন্তু বড় চাপা আলি সাহেব। বাইরে বড় চুপচাপ
থাকতেন, এ-সব কাউকে জানতে দিতেন না। তার শহরে আবির্ভাবের
হয়ত নানা কারণ ছিল। গ্রামের একমেয়েরি সহ করতে পারেননি।
অথবা নিঃসঙ্গ ধাকার আকস্মিক লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল।

মোটাসোটা, ভারীদেহ, থলোথলো, মুখাবয়বে একরাশ সাদা-
পাকা গেঁফ—এই মাঝুষ কিন্তু বাইরে অস্ততব গন্তবীর হলেও ভেতরে
বেজায় মজলিসী। নচেৎ বক্সুসংখ্যা নানা ধরনের এবং অনেক হয়
কীভাবে?

এক মাস আগে থেকে রেজা আলির জীবনেও বড় উঠেছিল।
আগে জীবিকা এবং সংসার পালনের মধ্যে তার সময় কেটে যেত।
এক আইনের প্রশ্ন ছাড়ি আর কোন প্রশ্ন অতি তীক্ষ্ণতায় জবাবদিহি
করত না তাকে। সংসারের ছাটখাট ক্ষয়ক্ষতি সরস প্রাণ কোন
রকমে সংগতির ভেলায় তুলে দিতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষয়ক্ষতির
পরিধি যখন স্তুপের উপর স্তুপ বিরাট জগদ্দল রচনা করে, তখন
সরস প্রাণ বোধ হয় শুকিয়ে যায়। রেজা আলির ক্ষেত্রে অস্তত
তা-ই ঘটেছিল। এত মৃত্যু—দীন এবং অসহায়—আর এক সঙ্গে
তিনি কোনদিন দেখার স্থযোগ পাননি। তাজা প্রাণ-মুকুল
থইথই করছে পথঘাট জুড়ে, ঘরের আঙিনায়, জলা-জাঙালে, নদীর
উপর—কত না সুগম-হৃগম এলাকায়। হঠাত কয়েক লহমা।
সব শুকিয়ে গেল অথবা কালো ছাই হয়ে গোটা দেশে লেপে দিলে।

দিনের পর দিন এই সব ছবি তাকে রেহাই দিত না, চোখ বুজলেই দেখতে পেতেন, মাঝুষ নিজের ভগ্নাংশ হয়ে কীভাবে আবর্জনার সামিল পড়ে আছে অথবা মাটির ভেতর সেঁথিয়ে গেছে। পরিত্থ শেয়াল এবং শকুন তাদের স্মৃতিস্তম্ভরপে জানান দিচ্ছে : এখানে একদা মাঝুষ ছিল। একটা দৃঞ্জ, প্রায় তিন দিন তাকে আহার স্পর্শ করতে দেয়নি। উচু বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল নীচে প্রায়-শুক্ষ সরু নয়ানজুলির উপর পাঁচজনের এক পরিবার। বোধ হয়, বাঁধের দ্রু-এক ফুট নীচে ঝোপের মধ্যে তারা লুকিয়ে ছিল। কারো চোখ পড়বে তাদের উপর এমন সন্তাবনা ছিল খুবই কম। অতর্কিত কোন দিক থেকে এলোপাতাড়ি মেশিনগানের গুলির চোটে সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পনর ফুট, মুখ থুবড়ে বা অস্থান্ত যৌগিক আসনের কায়দায়, ছিটকে পড়েছে। আশ্চর্য, একটা শিশু, হয়ত ছ-সাত মাসের, মা'র চুল মুঠিয়ে ধরেছিল। তার বন্ধমুঠি এখনও আটুট, মা'র সিথানের দিকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সমস্ত লাশের উপর সটান পড়ে ছিল এক বৃক্ষ। পিতৃতাস্ত্রিক সমাজের কর্তব্য তিনি মৃত্যুর পরও পালন করে গেছেন। আজীবন ক্ষেমঙ্কর, সকলকে দেখাই তো ছিল তার দৈনন্দিন আনন্দের উৎস। গোটা পরিবারের ছায়াশ্রয় তখনও নিজের ভঙ্গী পরিত্যাগ করেননি। একটি বালিকা পিতার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে, যদিও তার মুখ নাকের ডগা থেকে অনেকখানি উড়ে গেছে।

রেজা আলি গ্রামবাসীদের সহায়তায় পরে এন্দের কবর দিয়েছিলেন, অবিশ্বিত একই কবরে। শেষকৃত্যের ত্রুটি রাখেননি। মৃত্যু তো বহু চোখে পড়েছে। কিন্তু কারণ্যপরিচায়ক অবস্থান-ভঙ্গীর জন্যে রেজা আলির চোখ থেকে তা মুছে ফেলা অসম্ভব ছিল। আইনের রাজত্বে উকীল প্রয়োজন হয়। সেদিন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অস্তত আদালতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে। রক্ষক-ভক্ষকের এমন মহাসভায় আইনজ্ঞ অবাস্তর। একপাল

নেকড়ে অনপদের ভেতর দিয়ে মাংসাহার-পর্ব শেষ করে যেতে যেতে চৌকার দিছে এবং ক্ষুধাহীন বিধায়, সমৃদ্ধস্থ জীবস্তু সব কিছু সংহার করছে, কিন্তু উদ্বৃষ্ট করছে না। এই কারণ্যই হায়েনাদের মহত্ব এবং আইন। রেজা আলির এমন উপলক্ষ কিন্তু সত্য আকস্মিক। শাশানে বৈরাগ্য আসে। না, তার বর্তমান মানসিক অবস্থা কেবল পরিবেশ-জাত ব্যাপার নয়। তার সক্রিয় মন জীবন-প্রবাহের নকশা দেখতে পেয়েছিল। হয়ত বছদিন অনেক সৎ মাঝের সংসর্গ ফল অলঙ্কিতে কাজ করে গেছে। যা-ই হোক, উকীল রেজা আলি তার পুরাতন খোলসে আর চুক্তে পারলেন না।

হঠাতে দরজায় করাঘাতের শব্দে তিনি বেশ উৎকৃর্ণ হয়ে উঠলেন।
ঠক-ঠক-ক্ষণ.....।

ক'টা বেজেছে জানার উপায় নেই। টর্চের ব্যাটারী শেষ।
রাত্রে শহরে কেউ বাতি জালে না। কারণ, তোমার অবস্থান-
পরিচয় তোমার কাল, বা কাল না হোক, বিপন্ন হতে পারে।

কয়েকদিন আগেই তো একটা ঘটনা ঘটল। একব্যক্তি যুহ
আলোয় বাইরের জগতের কোন বেতার স্টেশনের সংবাদ
শুনছিল। নিবারণ অভ্যর্থনার একটা জোনাকি একটা ঝাড়বাতি বা
শ্বাশেলিয়ার। দুই পাঞ্জাবী জওয়ান যথাস্থানে উপস্থিত। দরজায়
করাঘাত। গৃহস্থামী কর্তৃক দুয়ার উঘোচন। ‘শালা, হিন্দুস্থানী
রেডিও শোন্তা হ্যায়?’

—নেই। আপ দেখিয়ে। ইয়ে রেডিও লুক্সেমবুর্গ হ্যায়।

—নেই শালা, তোম চাকুকা ভয় সে হিলা দিয়া।

গৃহস্থামী কী আর জ্বাব দেবে? ট্র্যানজিষ্টারখানা হাতে
যুলিয়ে গটগঠ দুই সিপাই বেরিয়ে গেল। সৌভাগ্যবান বটে
গৃহকর্তা! অল্লের উপর দিয়ে গেছে। প্রাণের কাছে তিনশ' টাকা
মূল্যের জিনিস কিছু নয়। ঐ ভদ্রলোকের বৃক্ষ জননী একটা ধাসী

মানৎ করেছেন। আগামী শুক্রবারে তা শোধ হবে।

রেজা আলির কিন্তু আর কোন সন্দেহ থাকল না। করাঘাত তারই দরজায় এবং বীচের তলায়। ভৃত্যকে জাগিয়ে তোলা এত রাত্রে অস্থায়। তাছাড়া অপমানের বোরা যদি কপালে থাকে, দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী?

অঙ্ককারে একটা মোমবাতি আর দেশালাই হাতে হাতড়ে-হাতড়ে তিনি দোতলা থেকে নেমে এলেন। দরজায় করাঘাত এবার একদম মৃত নয়। অতিথির বে-সবুর মন হাতে প্রবেশ করছে।

দরজার পাল্লায় একদম কান ঠেসে থেরে রেজা মুখ খুললেন, “কোন হায়?”

উহু’ জবান, কিন্তু ওদিক একদম স্তুক করে দিলে, আর কেউ করাঘাত করে না।

অমোয়াস্তিকর নীরবতা ছই দিকে। কারণ, এদিক থেকে যেমন ‘কোন হায়’ বেরোয় না, অন্ত দিকেও তেমন সব চুপচাপ।

রেজা আলির সন্দেহ এবার উদ্বেগে পরিণত হয়। তার কান অত্যন্ত পরিষ্কার। শব্দের অবস্থান সম্পর্কে তার হদিস নিভূল।

কতক্ষণ এইভাবে দাঢ়িয়ে থাকা যায়। রেজা আলি পুনরায় মুখ খোলেন, “কে?”

তাবাস্তর ম্যাজিকের কাজ দিলে। যাত ফের চালু হলো। তারপর বন্ধ মাত্র ফিসফিস আওয়াজ শোনা গেল, “আমি গাজী।”

—কে?

—আমি গাজী।

কানখাড়া রেজা আলির আর শুনতে ভুল হয় না, যদিও অতি অস্পষ্ট কষ্টস্বর। তারপর তার দরজার খিল এবং তস্কররোধী ছাঁড়কো খোলার ব্যস্ততাটুকু দেখার মত। তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বালাতে যা সময় যায়।

দরজা সামান্য খুলেই এক হেঁচকা টানে গাজীকে ভেতরে টেনে নিয়ে রেজা বলেন, “মোমবাতিটা ধরো।” আবার তস্কররোধী

প্রয়াস। তারপর তিনি মোমবাতি হাতে বক্সে অঙ্গুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন।

দোতলার এক কামরায় একক্ষণ জানালাগুলো খোলা ছিল। রেজা আলি তাড়াতাড়ি বক্স করে দিলেন। মোমবাতির আলো। কিন্তু বাইরে যত নিপ্পত্তি হোক, আলোই তো ঘূচবে না।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পাট সারলেন না তিনি। সোজা চোটপাট শুরু করলেন রেজা আলি, “তুমি এখনও এদেশে আছ? তোমার মাথাটা চিরকাল খারাপ দেখেছি, এই বয়সেও তার আর উন্নতি হলো না।”

—এদেশ ছেড়ে কোথায় যাব?

“আচ্ছা সে-কথা পরে হবে, এখন একটু জিরোও। ওই চেয়ারে বসো। এত রাত্রে এসেছ। কী খাবে বলো?” কথা শেষ করেই রেজা আলি মোমবাতি নিভিয়ে জানালা খুলে দিলেন।

ঝিরিঝিরি বাতাস ঢুকতে লাগল কামরায়। গাজী রহমান মুখ খুললেন, “শোনো, যা দরকার পরে বলব। এখন ক্ষিধে নেই। যদি তুক পায় আমার ব্যাগে মৃড়ি আর চিনি আছে, চলে যাবে।”

—আমি ভেবেছিলাম, এত শিক্ষক, অধ্যাপক—প্রায় বাষট্টি জনকে পাঞ্জাবীরা কত্ত্ব করেছে, তুমি নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। শেষে খবর পেলাম তোমার নাম ধরতে পারেনি। কি যে স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম সেদিন!

অঙ্ককারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রেজা আলি গাজী রহমানের দিকে। এমন উত্তাপমুখের কর্মদণ্ডে আর কোনদিন তাদের দুই হাত মিলিত হয়নি। প্রায় কিশোরকালীন সুগ্রন্থার আভাস ফুটে উঠে যুগল প্রোটের মধ্যে।

“কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে?” হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন রেজা আলি।

—পলাতক জীবনে আশ্রয় থেকে আশ্রয়স্থানে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন রেজা আলি এবং বললেন, “চোর-ডাকাত,

খুনীর দল সদস্যে ঘুরে বেঢ়ায় আর সাধুসন্ত লোকচক্ষুর আঢ়ালে
প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথাগোঁজার জায়গা খোঁজে। কিন্তু এ
আমি আর সহ করব না।” প্রায় চীৎকার দিতে গিয়ে খেমে গেলেন
পেশাদার উকীল।

—তুমিও দেখছি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাছ।

“অন্ত্যায়ভাবে ক’টা লোভী জানোয়ার গোটা বাঙালী জাতিকে
ধংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করাকে রাজনীতি বলো?” রেজা আলির কষ্টে ক্রেত্তু, ক্ষোভ, অশ্রু
একসঙ্গে মাথা চাড়া দিতে থাকে।

“তারই নাম রাজনীতি।” খুব সহজ গলায় উত্তর দিলে গাজী
রহমান এবং আবার যোগ করলে, “তোমাকে রাজনীতি করতে
হবে না।”

—তুমি গাজী রহমান, একথা বলছ? সারা জীবন শিক্ষকতার
আদর্শ সামনে রেখে, যে সামাজিক সকল প্রশ্নে মাথা ঘামিয়েছে,
স্বী-পুত্রের দাবী ভালমত মেটায়নি, তার মুখে এই কথা?

কামরায় দক্ষিণ দিকে জানালার পাশে দু’জন শোয়ার মত একটা
মামুলী খাট পাতা ছিল। মেঝের মাঝখানে ফাঁকা। উত্তর-পূর্ব
কোণে জানালার ধারে দুটো বেতের চেয়ারে বসা ছিল সাবেক দুই
বছু। খাটের তলায় একটা খসখস ওঠে। গাজী রহমান
এখন এত শব্দ-সচেতন যে তার কান এড়ায়নি। ফলে চোখ সেদিকে
ধাওয়া করে। ঝাপসা অঙ্ককার। পুরোপুরি সব ঠাণ্ডার অসম্ভব।

গাজী বললে, “খাটের তলাটা ঢাখো তো, রেজা। মোমবাতি
আলো। সাপ-টাপ হতে পারে।”

কিন্তু একটা জ্যান্ত মাঝুষ তলা থেকে মাথা বের করে, “সাপ নয়”,
উচ্চারণের পর সোজা খাড়া হয়ে দাঢ়ায় এবং বলে, “দুইজনে
কাইজ্যা করে ঘুমটার দফা দিলে।”

কঠুন্দর অতি চেনা। গাজী রহমান বিস্ময়ে আশ্চর্য, বলে উঠল,
“কিরণ রায়, তুমি? এখানে?” তিনজনেই বাতি না ধাকায়

ছায়ামূর্তি। কিন্তু খাটের তলা থেকে নির্গত ছায়া একদম দানবের কায়া থেকে বেরিয়েছে। তা সোজা এগিয়ে এসে চেয়ারে উপবিষ্ট গাজী রহমানের দ্রুই কাঁধে হাত রেখে বললে, “আমার ঘুমটা ঢুঞ্জনে তর্ক জুড়ে নষ্ট করলে তো।”

—খাটের নীচে? তুমি তো আচ্ছা বোকা।

—কেন, আহশ্বকি কোথা দেখলে?

—মিলিটারী হলে তো ইছুরের মত ধরা পড়তে।

—আজীবন বিপ্লবীকে সবক দিচ্ছে স্কুলমাস্টার। এই জগ্নে আদালতে তোমাদের সাক্ষী বারো বছর পেশায় থাকার পর অচল হয়ে যায়।

উভয়ের কথাবার্তায় বহুদিনের অন্তরঙ্গতা স্পষ্ট। কিরণ রায় কিছু অত্যন্তি করেননি। কৈশোর-যৌবনে তিনি ছিলেন সন্দ্রাসবাদী। জেলে সাম্যবাদে হাতেখড়ি, পরে আশনাল আওয়ামী লীগ। দেশ বিভাগের ফলে আঞ্চীয়স্বজন সকলে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিল। কিরণ রায় কিসের মাঝায় এদেশে পড়েছিলেন সহজে বলা শক্ত। নিজের প্রতি করুণায় মাঝে মাঝে তিনি জবাব দিতেন, ‘ইলিশ মাছের লোভে।’ এ-সব রসিকতা মাত্র। দেশের মাঝুষের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল, তা কোনদিন হারাননি। ঠিক দেশ বিভাগের পূর্বে সন্দীপের চরে উচ্চত মুসলমান-অন্তা কর্তৃক লালমোহন সেনের নিহত হওয়ার সংবাদ, শুনে কিরণ রায় মন্তব্য করেছিলেন, “পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ একদিন এই খুনের প্রায়শিক্ত করবে, যার আন্তরিকতার স্বরূপ পৃথিবীতে কোনদিন কোথাও দেখা যায়নি। আমি চিনি এদের।” তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হতে চাবিশ বছর কেটে গেছে। উন্নতরাষ্ট্র বয়সের বৃক্ষ কিরণ রায় এখনও এই দেশে আছেন সকল ঝড়কাপটা মাথায়। জনসাধারণের সকল স্মৃথ-চংখের শরিক, ত্যাগ-তিতিক্ষা-সহিষ্ণুতার প্রতীক।

গাজী রহমান অনুভব করে, বজ্রদীর্ঘ এই এক শালতরু এত ঝড়ের মধ্যেও কী নির্বিকার! অথচ সে ব্যক্তিগতভাবে একবাণিজ

নার্ভ, সহজে এমন মুখড়ে পড়ে যে, চিন্তার ক্ষমতা পর্যন্ত ঘূলিয়ে যায়। সঙ্গে ধনে তুমি-শব্দ যোগসেতু। কিন্তু রায়ের প্রতি গাজীর সমীক্ষা আকাশচুম্বী।

রেজা আলির সিগারেট খাওয়ার বাতিক আছে। কামরার অক্ষকারে দেশলাই জ্বালানোর বলকে গাজী একবার কিরণ রায়ের মুখখানা দেখে নিলে। তিনি তখনও তার সামনে ঝাপসা দাঢ়িয়ে। ঠোটে হৃষি হাসি। জীবনবোধের অনেক গভীরে প্রবেশাধিকার যাদের আছে, তারাই শুধু এমন ভাবলেশহীন গিন্টের কারবারী অথবা নানা দিকের টানে নাজেহাল অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার কারিগর। বিষে কষ্ট নীল। কিন্তু গোটা অবয়বে প্রাণদীপ্তি সাঁতার কাটে রামধনুর আদিগন্ত বিস্তার ছড়িয়ে।

গাজী রহমান নিজের কাঁধের উপর রক্ষিত কিরণ রায়ের দুই হাতের উপর আঙুলের চাপ দিয়ে বলে, “বসো, বসো। লড়ায়ে লোক। দেখো হলো আয় ঝুঁতুর পর, কিছু কুশল জিজেস করবে, না বগড়া শুরু করে দিলে।”

খাটের দিকে এগিয়ে বসে পড়লেন কিরণ রায় এবং বললেন, “লড়ায়ের ময়দানে আছি, ভায়া। এখন ছোটখাট সেন্টিমেটের দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথা? তবে আসল কথাটা বলে রাখা যাক। পরে ভুলে যেতে পারি। কেউ তো আর তরুণ স্মৃতিধর বা শক্তিধর নই। তুমি ঠিক বলেছ।”

“কি ঠিক?” বিশ্বিত গাজী রহমান প্রশ্ন করে।

—রেজা আলির রাজনীতির দরকার নেই।

“সারা জীবন রাজনীতির পর, তুমিও! ক্রটাস।” রেজা আলি আয় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

—অত বেসবুর হয়ো না। অবস্থা অহুয়ায়ী কাজের ধারা আছে, কৌশল আছে।

কিরণ রায় উচ্চারণ করলেন। তার কষ্টস্বর স্পষ্ট কিন্তু নাতি-উচ্চ। এ-সব বছ অভ্যসের ফল।

“কী রকম?” রেজা আলির মুখ দেখা যায় না। কিন্তু গলা জানান দেয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু আস্থাহীনতার আমেজ।

—এই যে আমি নির্বিদ্বাদ তিন হস্তা তোমার কাছে কাটিয়ে দিলাম, তার কারণ, তোমার রাজনৈতিক রং নেই। এখন প্রয়োজন হলে তুমি নিজেকে মুসলিম লীগার বলেও জাহির করতে পারো।

—তোবা, তোবা। ওই বেজশাদের আমি কোনদিন অশ্রয় দিইনি। আর এই বয়েসে—।

তাকে কিরণ রায় কথা শেষ করতে দিলেন না, বরং পালটা বাণবৎ উত্তর ছাড়লেন, “বামুন নতুন গোমাংস খেতে শিখলে তোমার মত কাণ্ড করে বসে। রয়-সয় ব্যাপার নেই। একবার গন্ধ পেলেই হলো, পৈতা খুলে দৌড়।”

রেজা আলি প্রতিবাদ করার স্বয়োগ পেলেন না। গাজী রহমান বলে বসল, “আমারও তাই মত। এই জগ্নেই আপন্তি তুলেছিলাম।”

“তোমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিপক্ষতা দেখে আমি খুব খুশী, গাজী রহমান।” কিরণ এই রায় উচ্চারণের পর পরমহৃতে ঘোগ করলেন, “কিন্তু—।”

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। নোক্তা কার জগ্নে, এই নিয়ে রেজা এবং গাজীর মধ্যে সন্দেহ দোলা থায়।

শেষে কিরণ রায় ধন্দ দূর কর দিলেন, “কিন্তু গাজী রহমান, তুমি কোন সাহসে এতদিন এইভাবে আছ। শুনতে পারি?”

“কোথায় যাব?” গাজী রহমান বেশ অসহায়ের মত শুধিয়ে বসে।

—কিন্তু এইভাবে তুমি দেশেক কী কাজে লাগবে? সদা জান্ নিয়ে টানাটানি। তারপর জ্ঞান বাঁচানোও শিখতে হয়, তুমি তো কিছুই শেখোনি।

—কেন?

—আগুর-গ্রাউণ্ড থাকা শিখতে হয়। তুমি বেঁচে আছ ওদের দয়ায়। জাতীয়তার পরিচয় দিয়েছে বটে পুলিশ-ভায়েরা।

পাঞ্জাবীরা যদি বাঙালী পুলিশের মধ্যে পেত তুমি এবং আরো
বহুজন কবে কৃপোকাণ হয়ে যেত। এখনও সময় আছে, কেটে
পড়ো।

—কিন্তু ভেগে গেলে আমি দেশের কি কাজে লাগব?

—কিছু কিছু মুক্ত এলাকা আছে, সেখানে তোমার মত প্রবীণ
শিক্ষক গেরিলা-শিবিরে বক্তৃতা দিতে পারে। যুদ্ধ তো শুধু অন্তরের
কাজ নয়। কেন লড়ছি, কিসের জন্য লড়ছি, তার সঠিক ইনিস
যদি জানা থাকে, তাগদ অনেক বেড়ে যায়।

—তা তো বুঝলাম।

—সেই জন্যে তুমি বিপ্লবী সেজেছো। বয়সও তো দেখতে হয়।

—তোমার বয়স কত?

—আমি তো আজীবন বিপ্লবে সবক নিয়েছি। তারপর শরীরটা
ঢাখো। ঘোবনে যখন সন্ত্রাসবাদী ছিলাম—!

কিরণ রায় চূপ করে যান। কিন্তু গাজী রহমান এবং রেজা
আলি কথার খেইয়ের সঙ্গে এক ঘটনা অবলোকন করেন আরো
নিঃশব্দে। শোনা যায়, কিরণ তার সন্ত্রাসবাদী আমলে এক
বিশ্বাসঘাতক কর্মাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাঁশবনের
অঙ্ককারে গলা টিপেই শেষ করে দিয়েছিল। অতিক্রিয়া কতটুকু?
সেদিন রাত্রে আর আহার করেননি, এক গ্লাস জল থেয়ে দিব্য ঘূম
দিয়েছিলেন। সেই আশুরিক শক্তি আর কিরণ রায়ের নেই, কিন্তু
খকল সহের ক্ষমতা এখনও বহু তরঙ্গকে লজ্জা দেবে।

“থাক সেকথা—”, কী ভেবে কিরণ রায় আবার প্রসঙ্গের জ্ঞের
টানেন, “তোমার পক্ষে এই বয়সে পেখমধারী বায়স-ময়ুর সাজা
অসম্ভব।”

“আমিও তাই বলি”, রেজা আলি সায় দিলেন। পরিবেশ বেশ
তেতে উঠেছে দেখে তিনি তখনই আবার কথার মোড় ফেরান,
‘গাজী, ঢাখো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করি।’

“না, শুধু হাত-মুখ ধূতে পারলেই হবে। ঠিক ঘূম আমার

না। আজ দেখা যাব।” খুব নিলিপি গলায় উচ্চারণ করলে গাজী রহমান।

সে নীচে গেল জলের সাহায্যে সব দিক থেকে কিছু ঠাণ্ডা হতে। তখন কিরণ মুখ খুললেন, “শোনো রেজা, ওর পালানোর বন্দোবস্ত আমাদেরই করতে হবে।”

“বন্দোবস্ত!” রেজা আলি সাবাসি নেওয়ার ভঙ্গীতে শব্দ তুলে যোগ দিলেন, “তা আমি আগেই করে রেখেছি। অনেকের কথা আমার মনে পড়েছে। এমন কি তুমিও বাদ যাও না।”

“আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না”, রেজা আলিকে নিরস্ত করলেন কিরণ রায়।

“এই এক জায়গায় আমি তোমাকে পেয়েছি।” রেজা আলি টেকা দিতে পেরেছে অস্তুত একটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিপক্ষ যেখানে ঝালু রাজনীতিবিদ। কালেই আঞ্চলিক যেখানে তিনি ফেরে পড়লেন, “এখানে তুমিও কাঁচা বলব না, ঠিক ধরতে পারোনি।”

কিরণ রায় খুব জেদী বা পরমত-অসহিষ্ণু ব্যক্তি নন, সাধারণ বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। তিনিও কিন্তু কিঞ্চিৎ দমে যান এবং অনুজ্ঞানীয় বন্ধুর দিকে তাকান, যদি কোন রেখাপাঠ করা যায়। গৃহ অঙ্ককার ইধায় সেদিক থেকে কোন সাহায্য আসা বক্ষ। তাই কিছু অধৈর্যের মত ধরক তিনি দিলেন, “রেজা, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা কী বলে ফেলো। রাতও বেশ হয়েছে। গাজী এলে ঘুমোনোর বন্দোবস্ত করতে হবে। ওর চেহারা দেখে বুকা কঠিন নয়, এ-সবের জন্যে বেচারা প্রস্তুত ছিল না।”

আলো থাকলে কিরণ রায় দেখতে পেতেন, ঝালু উকীল ঘায়েল সাক্ষীর দিকে যেভাবে তাকায়, রেজা আলি সেদিন একই ভঙ্গীতে অগ্রজ-বন্ধুর মুখের উপর লেজ ফেলেছিলেন। সঙ্গে কিঞ্চিৎ অনুচ্ছেব হাসি। অবিশ্বিত সমীহার গোড়া না কেঁসে যায় সেদিকেও রেজা সাহেবের লক্ষ্য আছে। তাই তাড়াতাড়ি বাক্য খালাস করেন, কষ্টস্বর পরিবর্তিত, বেশ সিরিয়াস, “এমন আর কোথাও হয়নি।”

—কী ?

—একটা সভ্য দেশের আর্মি খুঁজে খুঁজে তার মাইনরিটিদের মাঝে, যেখানে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। এটা তুমি লক্ষ্য করোনি, তাই আগেকার মত নিজের বিপ্লবী ইলেমের উপর আস্থা রেখেছ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। প্রথম এক মাস বাঙালী মেরেছে। হিন্দু-মুসলমান বাদ-বিচার নেই। এখন দেখে দেখে হিন্দু নিধন করছে। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ আনা যাবে, বেঙ্গারা ভাবছে। সেই পুরাতন কায়দা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জের ও পুরাতন কৌশল। জিম্মা সাহেবের জন্মদণ্ড জেঁক।

কিরণ রায়ের অগাধ শ্রদ্ধা বেড়ে যায় প্রবীণ উকীলের প্রতি। এক বিরাট পরিতৃপ্তি তার বুকে। মাঝুষটা ভাল। শুধু এই সূত্র ধরে বহুদিন আগে রেজা আলির সংস্পর্শে আসেন এবং কোনদিনই তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন না। গত আঠার বছরে সেই বাস্তি তার কত কাছাকাছি। অথচ রাজনীতির মাপকাঠিতে রেজা তো ব্রাত্য। বেসবুর হয় বিপ্লবীরা। জানে না, কিলিয়ে কঁঠাল পাকানোর মত মাঝুষ পাকিয়ে তোলা যায় না।

—তুমি ঠিক ধরেছ।

আঞ্চলিক বুঁদি কিরণ রায় সঙ্গীর কথায় সায় দিলেন।

—তাই তোমার দেমাক বিবেচনাপ্রস্তুত নয়। তাছাড়া কত মুসলমানকে লুঙ্গি তুলে প্রমাণ করতে হয়েছে, সে মুসলমান।

—এখানে তো ফেল হয়ে যাবো, রেজা।

কিরণ রায় তারপর ধিক্ধিক হেসে উঠলেন এবং বললেন, “বহু পরীক্ষা পাশ করেছি এক এক সংকৃতে। তোমাকে বলতে কী ! প্রেমের বক্তনও বহু বছর আগে ছিঁড়তে হয়েছিল। আগে সন্ত্রাসবাদী ছিলাম। এক রকমের ধর্মীয় আচ্ছন্নতা বহুদিন ধিরে রেখেছিল।

বিশ্বাস করতাম, বিপ্লবীর সংসার থাকা উচিত নয়। সেদিন নিজের
বিরক্তে লড়ায়ের প্রচণ্ডতা আমাকে প্রায় কাবু করে ফেলেছিল।”

ঈরৎ হেসে তখনই স্মৃত কেটে রায় ধামার খেকে যেন ঠুঁঠিতে
তুব দিলেন, “কিন্তু এই পরীক্ষার কথা আগে ভাবিনি। মুসল-
মানদের মধ্যে থাকতাম, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম।”

“এখনও মুসলমানদের মধ্যে থাকছ।”

“কিন্তু তারা বাঙালী নয়।”

“এই তফাত তো বোঝনি তুমি।”

“ঠিক।”

অঙ্ককারে নিজের বিরাট মাথা ঢুলিয়েছিলেন কিরণ রায়।
সায় নয়, হঠাৎ যেন তার দিব্যদৃষ্টিলাভ ঘটেছিল।

গাজী রহমান ফিরে আসতে প্রসঙ্গ এক মোড়ে গিয়ে থামল।

কিরণ রায় বললেন, “আমাদের সুচিস্থিত অভিমত, তুমি সীমান্তের
কাছাকাছি কোথাও থাকবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে পার হয়ে
যাবে।”

“আমি তো রাস্তাঘাট চিনিনে। তাছাড়া চেকপোস্ট আছে,
ঘাঁটি আছে। এসব বেড়া কী করে পার হব?”

“সে-ভাবনা আমাদের।” প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করে
বসেন কিরণ রায় এবং রেজা আচি সাহেব।

“বেশ। এমনিতে আমার সহ হচ্ছে না। প্রায় মনে হয়,
মগজে রক্তক্ষরণ হয়ে মরব।”

“তোমার চরিত্রের এই এক দোষ। এত ভাবপ্রবণতা নিয়ে
কী শক্তির মোকাবিলা করা যায়? তাঁর জগ্নে মাথা ঠিক রাখতে
হবে।”

“বুদ্ধি দিয়ে এসব আমি কী আপনার চেয়ে কম বুঝি?
কিন্তু মন শাস্ত হয় কোথায়? এই পরিবেশ আমাকে পিষে মারছে,”
অসহায় বালকের মত কথাগুলো উচ্চারণ করলে গাজী রহমান।

“তাই, হেথা নয় হেথা নয় অন্ত কোনখানে।” কিরণ রায়

স্বামী গলায় আবৃত্তি করলেন। ফিসফিস শব্দে কবিতা পড়ার ফল।

“কিন্তু কী হয়ে গেল, কী অপ্প দেখেছিলাম!” গাজী রহমান
বেশ আবিষ্ট উচ্চারণ করলে।

—যা হওয়ার তাই হলো। গোথ্খুর সাপের লেজে হাত দিতে
গেলাম, অথচ ছোবলের কথা ভাবিনি।

এই উভর দেওয়ার পর কিরণ রায় সহস্রা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
কিন্তু পাছে হৰ্বলতার অপরাধে বন্ধুদের কাছে ধরা পড়ে যান,
তাই আবহাওয়া পালটে দিতে দেরী করলেন না প্রত্যৎপন্নমতিহের
স্বত্বাবজ অধিকারীরাপে—“সেকথা তবে একটু হ-হতাশ না করলে
লোকে আমাদের পাথর বলবে। তবে সত্যিই আমরা পাথর!”

গাজী রহমান বন্ধুর চাতুর্য জালে বন্দী, সরল বিশ্বাসে শুধায়,
“সে কেমন?”

—বাংলাদেশের জনসাধারণ খাঁটি স্বর্গ-পিণ্ড। আমরাই মেকী
নেতা। বুরতে দেরী হয়। ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগ ধ্বংস
করো। জনসাধারণ দিলে ধ্বংস করে। আইয়ুব খাঁকে তাড়ালে। গেল
দশ বছরের স্বৈরতন্ত্র। দু-বছর আগেই উনসত্তর সনে গণঅভ্যুত্থানের
সময়, শক্ত প্রস্তুত ছিল না, আমরা স্বাধীন হতে পারতাম। তখনও
পিছিয়ে রইলাম। আবার ভুল। ভুল, ভুল। অথচ সাধারণ
মানুষ কত এগিয়ে গেছে। কারফিউ মানলে না, সাঁজোয়া গাড়ির
পরোয়া করলে না। আর আমরা নেতারা বুকে অতুচুকু বল-সঞ্চয়ে
পেছ-পা। তাই এই বিরাট খেসারৎ। দুঃখ হবে বৈকি গাজীর মত
মানুষের, কিন্তু আবার দাঢ়াতে হবে। দাঢ়াতে হবে কি? দাঢ়িয়েছি
না? আমাদের তরঙ্গ মুক্তিক্ষেত্রদের দিকে তাকাও। জননী
বাংলাদেশ সব গ্রামের যোগফল-সুখ নিজে শুদ্ধের হাতে বিতরণ
করছেন। তাই তো শুদ্ধের হাঁড়ের অঙ্গে এত তেজ...”

কিরণ রায় আবেগের বশে হঠাৎ স্থানকালের পরিমাপ হারিয়ে
ফেলেছিলেন। বহুদিন আর বকৃতা দিতে হয়নি। নিজেই বলেন,
“বাচালতা দূর হোক এদেশ থেকে। বাক্য হোক বন্দুক”, বকৃতা
৫২

দেওয়ার পুরাতন অভ্যেস হঠাতে চেপে ধরেছিল।

গাজী অভিভূত। অতি পুরাতন কথা বক্সুর মুখে পুরাণ হয়ে উঠে। তাই মনে বেশ তেজ কিরে পায় সে। সব জড়তা যেন নিমেষে উবে গেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে পা ফেলে তো সে চলতে পারবে না। নিজের অক্ষমতার প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ পায় হঠাতে মন্তব্যে, “খামোকা দেশের ভার বাড়াতে জন্মেছিলাম।”

ধৰক দিতে বিলম্ব করলেন না সাবেক সন্ত্রাসবাদী, “এই এক ধরনের নাকী-কাঙ্গা আমার অসহ। সংসারে প্রত্যেকের কাজ আছে ঘোগ্যতা এবং আপন-আপন ধরণ-অশুধায়ী। আমি যা করি, তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আবার তুমি যা করো, তা আমার সাধ্যের বাইরে।” অশুজ বক্সুকে স্টোক দিতে নয়, গুরুত্বের সঙ্গেই রায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

রেজা আলি এগিয়ে এলেন আরো ব্যবসায়ুলভ প্রস্তাবসহ, “কাল এখানে জিরোও। তিনজনে আবার কথন দেখা হয় কে জানে। পরশু সকাল থেকে যে-যার কাজে। তবে কিরণদা’ও সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাবে।”

অন্ধকারে গাজী যেন রাস্তা দেখতে পেলে এবং বললে, “ছ’জনে এক সঙ্গে তো যেতে ‘পরি।’

“না।” কিরণ রায় প্রতিবাদ জানালেন।

“কেন?”

—আমরা দাগী আসায়ী। আর ছ’জনে এক সঙ্গে ধরা পড়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মন্তব্য গাজী রহমান মেনে নিলে। কিন্তু তার সংশয় অঙ্গ দিক থেকে আসে, “আমি একা যেতে পারব?”

“তুমি একা খাকবে না। বন্দোবস্ত করছি। বোঝ না ক্যান?”
রেজা আলি শেষে উপভাষা জুড়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

হঠাতে তিনজনের মধ্যে স্তুকতা নামে। কারো কোন কথা বলার উৎসাহ নেই যেন। কিরণ রায় জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে

কী যেন দেখতে লাগলেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। গাজী ঝাস্ত। শুমোনোর বন্দোবস্ত তেমন কিছু নয়। কিন্তু শুমোতে তো হবে। কিন্তু কেউ উসখুস পর্যন্ত করে না।

এমন স্তুতি দেড় মাস গোটা বাংলাদেশ ঝুড়ে, হঠাতে কোথায় যে ভৱ করে। সাজানো-গোছানো জ্ঞানিকম স্থোভন পরিচ্ছদধারী মানুষে বোঝাই; একুনে হয়ত দশজন। কিন্তু সকলে চুপচাপ বসে আছে। অত্যেকে যেন এইমাত্র নিজের বুকে, পাছায় লাধি-লাখ্তি বেইজ্জতির কশাঘাত অন্তর্ভব করছে। তাই মুখ খুলতে অপারগ।

কিরণ রায় নিজের অতীত জীবনের নানা অধ্যায়-বিচরণ শেষে, ভাবছিলেন, বর্তমান সংকটের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। সমুখে স্তুক, অঙ্ককার মফঃস্বল শহর এক-একবার তার চোখে বিলিক দিয়ে যাচ্ছিল, যা আলোর কর্তব্যে সৌমাবন্ধ। চিন্তা স্রষ্টু খেই ধরতে বাধা দেয়। নিজের মনেই তিনি উচ্চারণ করে বসেন, “ঢাখো, ঢাখো।”

অপর দুইজনের বজ্জাহত-ভাব চিড় খায় এবং দুজনেই এক সঙ্গে শুধিয়ে বসে, “কী, কী ?”

—দেখে যাও। একটা গোটা শহর, হোক মফঃস্বল শহর, মুঝড়ে পড়ে ধাকলেও এক কথা ছিল—মড়ার মত নিষ্পাণ, এবং সঁটান।

তিনি ছায়ামূর্তি তখন জানালার ধারে। অত্যেকের অনুভূতি স্বতন্ত্র খাত থেকে একই ধারায় যেন মিশেছে। গাজী রহমান আবার নিজের মনের বল হারিয়ে ফেলে। অসহ এমন অঙ্ককার এবং সুমসাম-ভাব তার কাছে নতুন নয় গ্রাম-এলাকায়। কিন্তু শহরও একই ভাবে যৃত। গোটা দেশ, বোধ হয়, যৃত! এমন প্রশ্ন গাজী রহমানের মনের কোণে এলেও তা সে আমল দেয় না, বরং এই দুঃসহ বাক্হীনতা কাটিয়ে উঠতেই মুখ খোলে, “রেজা, লক্ষ্য করেছ ?”

—কি ?

—বিঁবিগুলো পর্যন্ত তাকে না।

কিরণ রায় এবার আর নিজেকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। যেমন দাঢ়িয়ে ছিলেন, তেমনই অবস্থায় ভাব-গদ্দগদ স্বরে সরব হন, “এই আমাদের সৌভাগ্য। এমন দেশে জন্মেছিলাম, যার কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেশের দ্রুংখে শরিক, ঘানবিকতা অর্জন করে বসে……। লাধির বদলে পাঁচটা লাধির আয়োজনে আমরা সফল হব না তো কে হবে? এই দেশকে দেখেছি, ধর্মান্ধতার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। আজ সেখানেই ধর্মান্ধতা ঘৃণ্ণ। এই অঙ্ককারও তেমনি একদিন কাহিনী হয়ে থাকবে মাত্র……।”

গাজী রহমান অনিব্রচনীয়তার স্বাদ পায় অস্পষ্ট-কর্তৃস্বর-মথিত এই অঙ্ককারে। অনেক ক্লান্তি গেছে শরীরের উপর দিয়ে সারাদিন এবং আজ রাত্রি পর্যন্ত তবু সে ঘুমানোর বিরোধী। কিরণ রায়কে কখনও সে এত ভাব-বিহুল দেখেনি। জেলে যেতে যেমন তাকে নির্বিকার দেখা যেত, তেমনই পার্টির সংগঠনের কাজে। অন্তুত এই ত্রিদাসীন্ত। আজ গাজী তাই বিশ্বিত হয়। কিন্ত ওদিকে তখন বোধহয় আত্মসমীক্ষা পালার সূত্রপাত।

হঠাতে ঘুরে কিরণ রায় বললেন, “দূর, শুধু মগজে গেঁজালে ছনিয়ায় কোন কাজ হয় না। চলো শুয়ে পড়া যাক।”

গাজী সম্মতি দিলে এবং রেজাকে সঙ্ঘোধন করে বললে, “তোমার হৃ-তিনখানা বই সঙ্গে নেব। বাঁশ আছে তো? না গাঁয়ে নিয়ে গেছ।”

—বই এখানেই আছে। কিন্ত তুমি সঙ্গে কিছু নিতে পারবে না।

—পারব না?

—না। চেকপোস্টে ধরলে কী বলবে? ছাত্র না শিক্ষক! অবিশ্বিত তোমার দাঢ়ি তোমাকে ছাত্র হওয়া থেকে অব্যাহতি দেবে। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে ধরলে তো হৃ-চার কথায় সব বেরিয়ে পড়বে। তোমার ওসব ট্রেনিং নেই। কেতাবের উপর গুদের ঘৃণা কর নয়।

মিহিরে গেল গাজী রহমান সঙ্গীর কথাবার্তায়। ঢাকা শহরে পাঁচ দিন ধরে ইউনিভার্সিটির মাঠে সে বইয়ের স্কুপ পুড়তে দেখেছে। বিভিন্ন হল ও ইউনিয়নের লাইব্রেরীর হাজার হাজার বই।

আজ সেই দৃশ্য আবার অবলোকন-বুঁদ গাজী রহমান নিজের মনে উচ্চারণ করে বসল, “বই.....বই।”

“ওকথা ভুলে যাও।” ধমক দিয়ে উঠলেন রেঙা আলি।

এটা ঠিক, শারীরিক অভ্যেস এবং মানসিক আকৃতি ইচ্ছামত বদলানো যায় না। ধাঁরা পারেন, তাঁরা বিশেষ ধাতু সময়ে গঠিত। গাজী রহমানের মনে বার বার এই চিন্তা অন্দোলিত হয়। সে তো কিরণ রায় নয় যে, সব সময় পরিবেশের সঙ্গে পাঞ্চালড়তে অভ্যন্ত। আবার রেজা আলির মত তার নির্বিকার হওয়ার ক্ষমতা নেই, জীবনের ক্ষুজ পরিধির মধ্যে বসবাসের ফলে যা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কিরণ রায় তেও বৃহস্পতির জীবনের সম্মোহ সামনে রেখেই সদাশৰ্বদা চলেন। তিনি কী ভাবে বরফের মত ঠাণ্ডা হতে পারেন, যেন কোথাও উভাপ নেই এতটুকু—যদিও শরীরে রক্তমাংস বর্তমান। আবার বিপদের মুখেও এই ব্যক্তি সহজ ঝুকি খুইয়ে বসেন নী। কিরণ রায়ের মুখ বার বার ভেসে উঠতে লাগল গাজী রহমানের সামনে। কিরণের আর এক রাজনৈতিক সহকর্মী আছে, একদা মুসলিম সৌগের জেলা-সেক্রেটারী ছিলেন। মিষ্টভাবী, শাস্ত চোখ, দোহারা শ্বাম চেহারা। তাকে উদ্দেশ্যিত হতেই দেখা যায় না, এমন কি যখন রাজনৈতিক মতামত নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কের বড় বয়ে যায়। জীবনকে এরা গড়েপিটে রপ্ত করেছেন।

ইঠাং হাসি পেল গাজী রহমানের। কিরণ রায় বা একদা মুসলিম শীগার, বর্তমানে শ্বাশশ্বাল আওয়ামী-পছী, বিপদের মুখেও বড় সহজ থাকেন। একবার অসাবধানতাবশত কিরণ রায়কে চেকপোস্ট পার হতে হয়েছিল।

পাঞ্চাবী জওয়ান জিজেস করে, “নাম বলো। নাম কিয়া ?”
“স্বদেশ বিহারী।”

গুরুধারী সৈনিক হাসি ছিটিলেই জবাব দিয়েছিল, “আচ্ছা, তোম বিহারী হাস্য। তব যাও।” তুমি-সঙ্গেধন কিরণ রায় এই বয়সে অপরিচিত কাঠো কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন না। ওই অপমান বেশ লেগেছিল তার। বাঙালী হলেই বিপদ এবং অপমান। আবার আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে অনেক সময় ফয়সালা মূলতুবী রাখতে হয়, তা কিরণ রায়ের মত মাঝুষেরাই পারেন। বিরাট চৌহদ্দি নিয়ে তাদের কারবার। তাই তার নকশা সাধারণভাবে চোখে দেখা যায় না। বজ্রদের বড় হিংসে হয় গাজী রহমানের। কিরণ রায় এখনও নিরাপত্তার কথা ভাবেনি, যদিও তার বিপদ ঢের বেশী। অধ্য সে পলাতক, নিশ্চিন্ত আঞ্চলিক সঙ্কানী। একবার ভেবে নিলে গাজী রহমান, চেকপোস্টে সে কী জবাব দেবে। আগে থেকেই তা বন্দোবস্ত করা আছে।

চলন্ত বাসেরই আর এক কোণায় বসে আছে এক পাতলা চেহারার রংশ-মুখ শুবক। রেজা আলি তার বেশী পরিচয় দেয়নি। শুধু বলেছিলেন, “এর নাম সৈয়দ আলি। আমার মতই ওকে বিশ্বাস করবে।” দেখে মনে হয়, কোন আপিসে ছোটখাট চাকরী করে সে। তারপর রেজা আলি আরো সতর্কতার সংকেত দিয়েছিলেন, “জিজ্ঞেস করলে, ধাবড়ে যেও না। সহজ উত্তর দেবে। তোমার মত লোককে নিয়ে মুশকিল। ট্যারাবাঁকা হতে শেখোনি।” রেজা আলি শেষে নিজেই সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গাজী রহমান তাকে নির্বাচন করে প্রয়োজনমত আচরণের আধাস মারফত।

হঠাতে বাসের গতি মনীভূত হয়ে এল। ড্রাইভার হেঁকে উঠল, “আপনেরা সবাই নামেন। সামনে ব্রীজ ভাঙ।”

এতক্ষণ বাসে চোখ বুঁজে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে থেঁয়ারি নেওয়ার চেষ্টা পেয়েছিল গাজী রহমান। এবার সে চমকে উঠল এবং ইতিউতি তাকাতে লাগল।

বাস থেকে নেমে পড়েই গাজী রহমান দেখতে পেলে ব্রীজের

পাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা শুনে গাজী রহমান বিস্তারিত জানতে পারলে, মুক্তিফৌজ বীজের বধেষ্ট ক্ষতি করেছে। কিন্তু একদম উড়িয়ে দিতে পারেনি। ভারী গাড়ি খুব সাধারণে পার হয়, কর্তৃপক্ষের মেরামতি হাত-লাগার পর।

যাত্রীরা হেঁটে বীজ পার হলো। বাস অতি টিমা-গতি এগোতে লাগল। অনেকে তামাশা দেখে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে। গাজী রহমান কোন দিকে তাকায় না। ঘোলা ব্যাগ হাতে অবনত-মুখ, শুধু পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখে।

আবার আরোহণ-পর্ব। যাত্রীরা যে-যার জায়গা দখলের পর বাস ছেড়ে দিলৈ।

গাজী রহমান বীজের দিকে একবার তাকানোর চেষ্টা পায়। পেছনে ঢাঙ্গা যাত্রীদের অবস্থা বড় বাধা। সে বিতীয়বার চেষ্টা নিলে না।

আকাশে কাঠফাটা রোদ্দুর। বাস ছাড়তে গরম থেকে কিছু নিস্তার পাওয়া গেল। গাজী রহমান এবার জানালার বাইরে চোখ সজাগ রাখে। এই জায়গায় হৃ-পাশে বসতি। ফলে মাঠের বিস্তার নেই কোথাও। গাজী রহমান কিন্তু চোখের বিশ্রাম প্রার্থনা করছিল। তা আর হয় না। মিনিট দুই পরে দৃষ্টি যেন ছ্যাকা খেলে। কয়েকটা ভিটে-বাড়ি চোপে পড়ল অগ্নিদাহের সব সর্বনাশ-লেখাসহ, বর্বরতার সাক্ষীরপে চারপাশের সবুজকে ব্যঙ্গ করছে। পোড়া কড়িকাঠ এখনও ঝুলে রয়েছে, একদম ভূমিসাঁ হয়নি। একটা ভিটা একদম সমান। শুধু কালো ছায়ের দাগ লেপ্টে রয়েছে। ভিটের নীচে চারা কতকগুলো খেজুরের গাছ ঝলসানো দেহেই বাতাসে আলোলিত। চারপাশের গাছপালা আর লতাগুলোর অচেল সবুজ ভিটের অধিবাসীদের অতীত স্মৃথির রং হিসেবেই যেন সূর্যের আলোয় আরো দীপ্যমান। অন্ন আয়তনের জায়গা। সামনে জেলা বোর্ডের রাস্তা। তিন দিকে প্রকৃতির বেষ্টনী। মাঝখানে কিছুটা

মাটি উচু করে ভিটা বাঁধা। এলাকার মাটি সাদা কিন্তু গোড়া
ভিটের উপর লাল। হৃষ্ণানো টিনগুলো পাঁপড়ের মত কোথাও
কোথাও এখনও চালুর পেরেকের সঙ্গে লেগে রয়েছে। একটা
দালানের দুর্দশা শুধু তার অবশিষ্ট অক্ষত ধামের বিদ্রোহী উপস্থিতির
মধ্যে ধরা পড়বে। মাটারের গোলা উপর থেকে ধূংসলীলা শুরু
করলেও নীচে তার জের, বোধহয়, কেবল কম্পন ও আণনের সাহায্যে
গৌচেছে।

গাজী অতি সহজে আজ ভাবপ্রবণতা থেকে দূরে থাকে।
মানুষের সুখ-হৃৎ হাসিকান্নার এইসব সুন্দর লীলাভূমি তার মনে
বিশাদ বা স্মৃতিচার্ণণার কোন অভ্যর্জন-কাপে উপস্থিত হয় না। কিন্তু
সে একান্তভাবে নির্বিকার, এমন বলা অস্যায়। হঠাতে কিল-চড়-বৃষি
খাঁওয়ার পর যেমন ধাঁধানো ভাব থাকে প্রহ্লাদের উপর, এ-ও হয়ত
তেমন একটা কিছু। অথচ গাজী রহমান বোধশূণ্য নয়। সম্মুখে
শূণ্য ভিটার উপর অবশিষ্ট একটি মাত্র খুঁটি ধরে দাঢ়িয়ে আছে
উদাসদৃষ্টি এক আলুথালু-চুল বছব পাঁচেকের ফালি-পরিহিতা
বালিকা। এবার গাজী রহমান বিচলিত হয়ে ওঠে। বারেক
বাসের গতি ক্রত সব আড়াল করে দিলে। মানুষ যত সহজে ধূংস
হয়, তার মূর্তি অত সহজে লয় পায় না। বালিকার মুখ ক্রমশ
বিস্তৃত, শেষে গাজী রহমানের সব দৃষ্টি ছেয়ে ফেললে। আর কিছুই
দেখছে না সে। শুশান-চহরে কী সাহসে এসে দাঢ়িয়েছে, অতুকু
অবোধ আস্থা? গাজী দেখতে পায়নি ওই চোখে কী ছিল?
করিয়াদ, অভিশাপ? হয়ত অভিশাপ। এসবে বিশ্বাস গাজী
রহমান কবে হারিয়েছে। কিন্তু নিজেকে সাস্তনা দিতে আর কোন
শব্দ সে খুঁজে পেলে না। অভিশাপ, অভিশাপ.....

বাসে সবাই বোৰা। ইঞ্জিনের খটখট শব্দ কেবল দূর-দূরান্তেরে
প্রতিক্রিয়া তুলছে। ধাণুব অরণ্য যেন আর শেষই হবে না। কিন্তু
এক মাইল পরে মাঠের বিস্তার দোড়রত। হাঁক ছেড়ে বাঁচে গাজী
রহমান। এখানে এক-হৃ মাইল বেগুনের ক্ষেত ধূসর রঞ্জের পট

বানিয়ে রেখেছে। নীচে কালো কালো বেগুন যেন দোলনা-বিহারী, ভালোর বিভিন্ন উচ্চতায় গোলদেহে আসীন। হঠাৎ লাল আলুর ক্ষেত্র আবার রঙ বদলে দিলে। লতার ডগাগুলো কোথাও কোথাও খাড়া, সূর্যমুখী লঙ্কার মত আলোর জন্য তৎপর। মাঠে কাজকর্মরত কুষক আছে। কিন্তু গানের একটা কলিও কোন দিক থেকে কানে আসে না। গাজী রহমান সুরেলা যে-কোন শব্দের আজকাল বৈরী। গান তার কানে সয় না। কী যেন হয়ে গেছে কানের পর্দায়। অথচ সংগীত-পিপাসায় সে এই বয়সেও রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছে, শহরে কোন ভাল ঝঁপদী গায়কের আবির্ভাবে।

গাজী রহমানের পরিচিত নয় এই এলাকা : সৈয়দ আলি পাশে থাকলে সব জানা যেত। কিন্তু রেজা আলি উপদেশ দিয়েছিলেন। “বাসে কাছাকাছি বসবে না! অবিশ্বিত পায়ে-হাঁটা রাস্তায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সৈয়দ সব জবাব দেবে।” গাজী রহমানের কিন্তু তেমন আস্থা নেই সঙ্গীর উপর। যদি তাকে ধরিয়ে দেয়? কিন্তু রেজা আলির লোক যথন, অমন ধারণাও সত্য ইতরতা। অজ্ঞ পায় গাজী রহমান। বাসে কিছু কথাবার্তা আছে, তা যত মাঝুলী, তত প্রাণহীন। হৈ-হল্লা করে না কেউ।

হঠাৎ কণ্টার, যে দরজার উপর দাঢ়িয়ে ছিল, নাতিউচ্চ কঠে বললে, “সম্মুখে চেক হৈত্ পারে। আপনেরা যে-যার সীটে চুপচাপ বসেন।”

চেক !! !

এই শব্দ যাত্রীদের মধ্যে চাপা আলোড়ন সৃষ্টি করে। গাজী রহমান সৈয়দ আলির দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখ কালো, এবং ঠোট নেমে গেছে। কিন্তু সে ধড়িবাজ ছেলের মত সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি বের করে ফুঁকতে লাগল, আদল যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে।

নেপথ্যে একজন জবাব দিলে, “কণ্টার সাব, এখানে ত চেকপোস্ট থাকনের কথা না। চেকপোস্ট আছেগা ফ্লানা আমের লাগে।”

“নতুন বসাইতে পারে। মিলিটারী জৌপ দেইখ্যা আমি
আপনেদের ছঁশিয়ার কইরা দিলাম।”

কগুল্পারের আরো কিছু হয়ত বলার ছিল। কিন্তু বিপরীত
দিক থেকে সঁ-সঁ। শব্দে ছটো মিলিটারী-জৌপ নিকটে আসামাত্র এক
সিপাই হঁক মারলে, “রোকো—।”

গাজী রহমান আশ্চর্যভাবে কিন্তু নির্বিকার। সে আড়চোখে
দেখে নিয়েছে একটা ‘কেরিয়ারে’ পনরজন মেশিনগান ও রাইফেলধারী
সৈন্য। অন্য জৌপে ড্রাইভার ও একজন অফিসার। পেছনের সীটে
প্রস্তুত মেশিনগানসহ এক সৈনিক উপবিষ্ট। এতক্ষণ যাত্রীদের
হাল-হকিকৎ জানার কোন কোতৃহল ছিল না। এবার সে যে-সব
মুখ তার সাঁট থেকে দেখা যায়, নিরীক্ষণ করতে লাগল। তিন-
চারজন স্থানেই যুবক আছে। বাকি আধবুড়ো অথবা জীর্ণস্থান্ত্য।
সৈয়দ আলি জোওয়ান হোলেও জীর্ণতায় মান্দাতা।

চেক শুরু হয়ে গেল জনা পাঁচ সিপাইয়ের তত্ত্বাবধানে। একজন
জিঞ্জেস করলে, “ইদার মুক্তি ফর্ডেজ হায়?”

কেউ কেউ জ্বাব দিলে—না। কয়েকজনকে শুটকেশ খুলতে
হলো। একজন গওখানেক ডিম সিদ্ধ করে এনেছিল পথে খাওয়ার
জন্মে। তার উপর জিঞ্জাসাবাদ বেশ কড়া শুরু হয়।

—এই চারটো আগো কিংড়ি লায়া?

সে বেচারা উর্ধ্ব জানে না, কোন রুকমে কথা বলার চেষ্টা
পায়।

—হাম এক আদমী।

—আ-রে পাঁচ নেহি লায়া কিংড়ি?

সে জ্বাব দেবে কী, হাত কচলায় এবং অহুনয়-মাখা কর্তৃ
উচ্চারণ করে, “জনাব, জনাব.....”

অভয় দিলে এক সিপাই, “আঁয়েন্দা পাঁচ লাও।” কথা শেষ
করে তারা চারজন এক-একটা ডিম বুশ শাট্টের পকেটে ঢোকালে।
পঞ্চমজন বঞ্চিতের দলে। সে আবেদন ছুঁড়লে, “দেখো ইয়ার,

হামেভি কুচ চাহিয়ে।” সে ডিমের বদলে একজনের একটা ছ-ব্যাটারী টর্চ পক্ষেতে হেফাজত করলে।

গাজী রহমানের পালা এল। ক্রিব রায় তাকে ভালিম দিয়েছে একদম সাগ্রহের মত। সেইমত জবাব দিলে।

—কিয়া করতা?

—ছোটা সি বিজিনেস।

—সামানা?

ব্যাগে লুঙ্গি পিরহান টুকিটাকি ছ-একটা জিনিস সম্বল। কাজেই চেক-পর্ব আর কী ভাবে লম্বা হবে? যাত্রীদের কারো কারো জিনিস কমে গেল। তা যাক, মালের উপর কারো অত দরদ নেই। আন্ বেঁচে গেলেই সর্বাঙ্গ কুশল।

ডিমবক্ষিত সিপাই, বোধ হয় ধর্মপ্রচারক। সেইমেশিনগান হাতে হেঁকে উঠল, “সাব মুসলমান হায়?”

—জী, হঁ।

কোরাস উঠল গোটা বাস জুড়ে।

গাজী রহমান নাকে একটা শব্দ করেছিল কোরাসে শরীক হতে।

—দেখো, হিন্দু কুই নেহি হায় ত? পাকড়ায়া ত তোম্লোগ কা চেহারা ভি খারাপ হোয়ে যায়েগা।

—জী নেহি, কুই হিন্দু নেহি।

—কলেমা জান্তা?

—জান্তা।

—পাকিস্তান মাংতা?

—মাংতা?

—বছৎ আচ্ছা। লেকিন আগু জেয়াদা লাও। হাম মুসলমান ভাই হায়। মূলকা কা হেফাজৎ করতা। হামকো খেলানে সে কুচ নোক্সান নেহি হায়। আচ্ছা, সামালেকুম।

—সামালেকুম।

উত্তর সবই কোরাস-সমন্বিত ।

গাজী রহমান আসলে রসিক মাঝুৰ । সে তামাশা বেশ উপভোগ করছিল । অসোয়ান্তির স্মৃতোয় আৱ ঝুলতে হয় না । ভালয়-ভালয় গেৱো কাটছে । সৈন্ধদেৱ দিকে সে কয়েকবাৱ বেশ নিৱীক্ষণেৱ ভঙ্গীতে চোখ ফেললে । অবিশ্বি খেয়াল থাকে, আবাৱ পালটা ওদেৱ দৃষ্টিপথে না পড়ে যায় । হঠাৎ খেয়াল গজালেই হলো । তখন আৱ রক্ষা থাকবে না ।

চেক-পৰ্ব প্ৰায় শেষ । এমন সময় এক সিপাই তাৱ সঙ্গীৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৱলে, “এই কাইয়ুম ?”

—কিয়া ?

—ও দেখা ?

—কিয়া ?

তাৱপৰ আঙুল বাড়িয়ে সে একটা সীটেৱ দিকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৱলে । গাজী রহমান এবাৱ সচকিত, যেন দেখেও কিছু দেখলে না, এমন ভাগেৱ আশ্রয় নিলে । কিন্তু তখনও তাৱ কাছে পৰিস্থিতি অজ্ঞাত । তবে অস্থাভাৱিক একটা কিছু ঘটেছে, এমন আশঙ্কাৱ জলে তাকে সাঁতাৱ কাটতে হয় ।

পেছনেৱ দিকে বসেছিল গাজী রহমান । কাজেই সব যাত্ৰীৱ মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না । কাৱ কী বয়স, কে কেমন অবয়বেৱ—এ সব নিৱীক্ষণেৱ কৌতুহল থেকে সে মুক্ত । পাগল আৱ এক পাগলেৱ চিকিৎসা কৱতে অক্ষম । নিজেই সে প্ৰাণভীত । নিৱীক্ষণেৱ জন্য শক্ত ডাঙা লাগে পৰ্যবেক্ষকেৱ ।

সিপাই দুটো একটা সীটেৱ সামনে গিয়ে দাঢ়ায় ।

কাইয়ুম নামক জওয়ান এবাৱ সঙ্গীকে শুধায়, “কিয়া ?”

—এ দোনা কো বড়া ডেঞ্জারাস মালুম হোতা ।

—তোম এহি সেঁচতে হো ?

—হঁ ।

হ'জনকে ওদেৱ খুব বিপজ্জনক মনে হয় । সেই মজুৰ ঝুগল

উত্তর মুখে বসেছিল, গাজী রহমান তাদের দেখতে পেলে না।
উদ্বেগ-উদ্বেলিত হাস্যে সে কালগণনা করে।

কাইয়ুম সঙ্গীর মন্তব্যের প্রতিবাদে জবাব দিলে, “আ রে মমতাজ,
হোড়ো। ডেঞ্জারাস কুচ নেহি।”

—নেহি। ডেঞ্জারাস হায়।

হজনের মতভেদে ক্রমশ জমাট হতে লাগল। গোটা বাসের
যাত্রী একাকার, স্তুক। হয়ত স্বাভাবিক নিঃখাস পর্যন্ত কেউ
ফেলছে না। ওদিকে সিপাই-যুগল তর্ক করে চলেছে।

—ডেঞ্জারাস হায়।

—নেহি।

—হায়।

—নেহি।

বেশ ঝাঁজ তুলে মমতাজ আসামীদের ছক্ষু দিলে, “এই, তোম
দোনো উত্তার যাও। ওঠ্ঠো।”

যারা বচসার নিমিত্ত, তারা এবার সীট ছেড়ে দাঢ়িয়ে পড়ল।
গাজী রহমান তাদের এক লহমা দেখে নিয়েছে। সুষ্ঠাম স্বাস্থ্যের
হৃষি যুবক, বয়স তিরিশের মধ্যে। একজন ক্লিন-শেভ। অপরজন
হয়ত একদিন ক্ষোরকর্ম-বিরহিত, তাই মুখের আদল দূর থেকে বিষণ্ণ
দেখায়। গাজী তখনই চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার আস্থামগ্ন হয়।
কিন্তু কোন চিন্তাই আর তার মগজে নেই। ফাঁকা মরুভূমির মধ্যে
মরীচিকা-গ্রন্ত দিশাহারা ব্যক্তির মত রক্তের তোলপাড়ে সে রাস্তার
ইঙ্গিত পায়।

বাধা দিলে কাইয়ুম ধান আসামীদের, “নেই—বয়েঠ যাও।”

—এই তোম উত্তার যাও।

—নেই, বয়েঠ যাও।

মতভেদের তাপ ডিগ্রি-ডিগ্রি বেড়ে গেছে এবং যাচ্ছে। যাত্রীরা
শীতল, চেকার যুগল উত্পন্ন।

হৃষি সিপায়ের কঠস্বর পর্যন্ত শেষে স্বাভাবিক গ্রামে ধাকে না।

জীপে বসেছিল এক অফিসার। ক্যাপ্টেন। প্রথমতঃ, এত বিলহে
সে বিরক্ত। দ্বিতীয়তঃ, বচসা এবং আত্মকলহ তাকে কিছুটা
উত্তেজিত করে তোলে।

সে জীপ থেকে নেমে বাসের জানালার কাছে ঢাঙ্গিয়ে
অধস্থনদের জিজ্ঞেস করলে, “কিয়া হয়া ?”

কাইয়ুমের পাকানো গোঁফ তার মুখের চেয়ে লম্বা। কিন্তু মেজাজ
অত কড়া নয়। সে মোলায়েম কঠে অফিসারকে অকুস্থলে আসতে
অনুরোধ জানায়।

মামলা দাখের করলে ছইজনে নিজেদের শুক্তি সহ। বিচারকের
রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, “আগার সক হয়া তোমলোগ্‌কা,
তব দোনো-কো উতার লো।” অর্থাৎ যদি তাদের সন্দেহ হয়ে
থাকে, হজনকে নামিয়ে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

অফিসার তবু অন্তত আসামীকে শুধায়, “এই কাহা
জায়েগা ?”

—আপনা দেহাং।

—আচ্ছা, আব ওতার যাও।

যুবক এতক্ষণ শান্ত ছিল। এবার কিন্তু সে বেশ উত্তেজিত
কঠে প্রতিবাদ জানায়, “মাই বেকসুর ছঁ (আমি নিরপরাধ)।”

“ওতার যাও।” অফিসারের আদেশ আদৌ মোলায়েম
নয়।

“মাই বেকসুর ছঁ।” যুবক নিজের অধিকার পুনরায় শব্দে
রূপায়িত করলে।

—এ জোওয়ান-লোগ, ইসকো পাকাড় করকে নৌচে লে যাও।
বড়া বেতমীজ।”

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ।

সিপায়েরা ছক্ষু-তামিলে এগিয়ে আসতে যুবক তারস্থরে চীৎকার
দিতে লাগল, “মাই বেকসুর—”, তার বাক্যের ‘হ’ আর শেষ হয়
না, এক সিপায়ের অক্ষমাং ধাক্কড়ে স্তুক।

କିନ୍ତୁ ହୁମିନିଟେ ଆଉଛି, ବାସ ଥେକେ ନାମାର ସମୟ ଯୁବକ ଯାତ୍ରୀଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୀଂକାର ଦିଯେ ବଲଲେ, “ଭାଇସବ, ଆମାର ସ୍କ୍ରୁଟକେଳ ଆମାର ଜ୍ଞାନ କାହେ ପୌଛେ ଦେବେନ ।” ଅମୁକ ଗ୍ରାମ ପୋସ୍ଟାଫିସ, ଫଳାନା ଜେଳା ।

“ରୋକୋ”, ଆବାର କ୍ୟାପେଟନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ବାସେର ସବ ଯାତ୍ରୀ ଯେଣ ଘୁମ୍ଭୁଟ । ଅଫିସାର ଏକଙ୍କନେର ଦିକେ ତର୍ଜନୀ ବାଡ଼ାତେ ସେ ଆତକେ ଜେଗେ ଉଠିଲ । ତଥନ ଅଫିସାର ଅନ୍ଧ କରେ, “ଏ—ଇ, ବାଂଲା ମେ କିଯା ବୋଲା ?”

ସ୍ଵପ୍ନାବିଷ୍ଟର ମତ ଉତ୍ତରଦାତା ଯୁବକେର ଶେଷ ପାର୍ଥିବ କ୍ରାମନାର ହମ୍ବି ଦିଲେ ।

ଅଫିସାର ମୁଖ ଖୁଲଲେ ଜ୍ଞାନଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, “ଉସକୋ ସ୍କ୍ରୁଟକେଳ ଉତ୍ତାର ଲୋ ।”

ଆସାମୀ, ଚୋରାଇ ମାଳ, ପୁଲିଶ-ଦାରୋଗା ଯେଣ ଗେରହର ବାଡ଼ୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରଲେ ।

ଯାତ୍ରୀରା ମନେ ମନେ ହାଁକ ଛାଡ଼ିଛେ ହୟତ । ସକଳେ ଚୋଥ ଖୁଲେ ଅନ୍ତତ ତାକାଯ । ତାରା ଦେଖିଲେ, କାଲୋ ଫେଟି ଦିଯେ ହୁଇ ଯୁବକେର ଚୋଥ ବେଁଧେ ଜୀପେର ପେଛନେ ତାଦେର ଗୁଦାମଜାତ କରା ହଲୋ । ‘ମଁଇ ବେକ୍ସୁର ହଁ’ ଚୀଂକାର ତଥନ ଦଶଦିକେର ବନିଆଦ ଧରେ ଟାନ ମାରଛେ । କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଆର ଏକଟାନା ହଜ୍ଜେ ନା । ସିପାଇଦେର ଗାଲ ଏବଂ ମାତ୍ରା-ଦାନେ ତା ବ୍ୟାହତ ।

ବାସ ଥେକେ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟଇ ଶୋନା ଯେତେ ଲାଗଲ, “ଏଇ ଶାଳା, ଚେଲୋଓ ମାଂ ।”

“ମଁଇ ବେକ୍ସୁର ହଁ”—ଯେଣ ଶେଷ ଚୀଂକାର ଦିଲେ ଯୁବକ ଶୃଧିବୀକେ ସହ୍ଵୋଧନ କରେ ।

ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧାବମାନ ଜୀପେର ଶବ୍ଦେ ଆର କୋନ କିଛି ଶୋନା ଗେଲ ନା ।

গাজী রহমানের খোঁয়ারি ভাঙল, বিছ্যৎ-স্পষ্ট ! সে অনুভব করে, তার এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবৃত্তী কৃচ্ছু তার গোড়ায় নিমেষে ‘সব বুটা হাওয়’ হেঁকে কে যেন লাধি দিয়ে গেল। আঘ-সম্মাননার আর কোন অবলম্বন নেই তার। কসায়ের দোকানে কীমা-তৈরীকালীন মাংসপিণ্ডের উৎক্ষিপ্ত টুকরার মত সে বিবেকের ছুরির সামনে অগুমাত্র, গোটা মানব নয়।

বাসের জ্ঞানালার শিকে মাথা চেপে গাজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বালকের মত কাঁদতে চেয়েছিল। যুবকের মুখ, শেষ আর্ত রব সম্ভল-পটে তার কাছে ধরা পড়ে। মাতালের ইমেজ-মুখের মন্তিককোষের আওটানির মত তোলপাড় করে তার সারা বুক। সে কেন কোন প্রতিবাদ করল না? কিরণ রায় গোটা সমাজের নকশা বোঝার চেষ্টা পায়। তিনি বলতেন, “ভিক্ষে দিয়ে দেশের মাহুষের মুখে হাসি কোটানো উদ্যমের অপচয় মাত্র। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হয়ত প্রশংসনীয়। কিন্তু তা সার্বিক ফলের সঙ্গে মেলে না। তাই প্রতিকারহীন অঙ্গায়ের উপর উপরি-উপরি আঘাত, শ্রেষ্ঠ ইটের দেওয়ালে মাথা ঠোকা।” কিন্তু কোথাও তো কাউকে শুরু করতে হবে। সে কেন চুপ করে রইল? চোখের সঙ্গে তার বিবেকও কি বুজে যায়নি?

বাস নয়, যেন চলন্ত শবাধার। ভেতরে কতগুলো মড়া উপবিষ্ট। গাজী রহমান ভাবলে, তা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই কারো। বাসের জ্ঞানালার শিকে মাথা আরো সজোরে চেপে ধরল সে। এখনই করোটি ভেতে চুরমার হয়ে গেলে কোন আফসোস থাকত না। মিথ্যের সামনে একটা সকল বাস পর্যন্ত দাঢ়ানোর সাহস পেলে না। যুবককে ধন্তবাদ, সে তবু নিজের সাফাই জগৎকে আনিয়ে দিয়ে গেছে। হাতিয়ার বিবেকের শক্তি। এখন ক্ষেত্র-অনুযায়ী দেখা যায় মিত্র। তিরিশ জন লোক, পাঁচজন কি একজনের সামনেই রা কাড়ত না। অন্ত্রের নীরব ভৎসনা জ্বরুটির এত শক্তি? সে কিরণ রায় বা রেঙা আলির মত ঔগ-নায়ক

নয়। রেঙা কৌভাবে বদলে গেল? অথচ আবাতে হজৈতঙ্গ সে ঝাগুত পেলে। কিরণ রায়ের দূরদৃষ্টি আছে। তাই হয়ত শাস্তি ধাকতে পারে। রেঙা আলিকে তিনি পছন্দ করতেন, মাছুষটা সৎ বলে। অথচ মতামতে কত ফারাক। এখন রেঙা আলি পর্যন্ত অস্ত্র গ্রহণে প্রস্তুত।

পরদিন তিনজনের কথাবার্তার মধ্যে গাজী রহমান প্রাচীন প্রসঙ্গ উঠাপন করেছিল। কিরণ রায় মিষ্টি হাসি ঘোগে উত্তর দিয়েছিলেন, “রাজনীতি করো আর যা-ই করো, মাছুষটা তো করবে। তাকে দেখবে না? ঢাখো, রেঙা এখন আমার মতই রাজনৈতিক জীব। অথচ এ-সবের ধার ধারত না। নিজের গন্তব্য মধ্যে তার সতত আশ্চর্যজনক। তাই আমাকে যেমন ও সহ্য করেছিল, আমিও ওকে সহ্য করেছিলাম। আজ ঘুঁটি কোথায় ঢাখো। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে।” কিন্তু তার বিবেক লাশের অভ্যন্তরে চুকে বাঁচার চেষ্টায় ব্যাপ্ত। নিজের কাছে আর নিজের অবলম্বন নেই। খোয়ার-বিদ্বাস গাজী রহমান জানালার শিকে চরম আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন।

পাশের সীটে দু'জন ফিসফিস কথা আরম্ভ করেছিল এতক্ষণে। ওই শব্দের টেট তাকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস দিচ্ছিল, হয়ত কিছু পাওয়া যাবে, মজ্জমানের মত পানির উৎ র হাত তুলে থাবি খেতে হবে না।

—আপিসে চাকরি করে।

—হ।

—ন। ব্যবসা করে।

—ক্যান?

—আপিসের বাবু-বাবু চেহ্ৰা—।

—তা হৈত্ত্ব পারে।

—নতুন বিয়া করছে, মনে অয়।

—আহা, বেচারা বউ আজ হনিবাৰ তুলা-(কামাই) আইব, পথ চাইয়া আছে।

প্রতীক্ষার সড়ক কত দীর্ঘ হতে পারে, আর বধু জানবে না
কোনদিন।

—ঠিকানা কইল। গাঁর নাম আছে।

—আছে।

—অহন বাদ দাও। পরে চিডি দিমু।

—আহা, বদ-নসীব বউ...

গাজী রহমান জ্ঞানালার শিকের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণাভার উজ্জ্বল
করে দিতে চাইলেও ব্যর্থ মনস্কাম। খোলা কানই বরং তাকে
আনমনা হওয়ার স্থৰ্থেগ দিয়েছিল। বউ-শব্দে সে নড়েচড়ে উঠল।
শিকের উপর থেকে প্রবীণ শিক্ষক মাথা সরিয়ে নিয়েছে। এক বলক
ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল মুখের উপর। এই স্পর্শ এবং কানের
সড়ক ধরে সে নিজ গৃহে পৌছায়। বউ, ছেলেমেয়ের কথা তার মনে
হয়নি এতদিন, তা নয়। মগজ ধাঁধিয়ে গেলে বেদনার উপস্থিতি
ঠিক থাকে কিন্তু তা দৈহিক যন্ত্রণা হয় না। বরং অশ্রীরী এক
ধরনের তীব্র অনুভূতির আকার লাভ করে, যেখানে বিশেষ কোন
মানব-মানবীর মুখ আঁকা হয় না। ওই বিমূর্তভার মধ্যেই
সোয়াস্তির বিনাশ ঘটে। কেলীয় কোন কারণ নেই। অথচ তুমি
আইচাই করছ। ডাঙায় আঁশ-ছাড়ানো কই মাছের তো মুক্তি
আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণশূন্ত। অবধারিত। কিন্তু মাঝুষ
এখানে যেন মহাকালের দোসর, আপন ছাঃসহ অমরত্ব নিয়ে ছটফট
করে। জ্বীর মুখ, কঙ্গার মুখ, আরো পরিজনের মুখ দ্রুত অপস্থিত্যমান
—একটু বিশদ দেখার আবেগের সঙ্গে বরং প্রতিবন্ধিত। চালায়।
অন্তরের প্রতিক্রিয়া এখানে সহায়, চোখ যখন নাচার।...তোমার
জ্বী বিদ্যায়কালে এক দিকে মুখ ফিরিয়ে অঁচলে মুখ ঢেকেছিল,
যেন তুমি দেখতে না পাও। স্নেহের বিনিময়ধারা কঙ্গার চোখের
পানি তুমি নিজের গন্দেশেই সওদা করেছিলে। অঙ্গদক হওয়ার
আগে বাংলাদেশ পুড়েছিল বোমায়, সর্বহারাদের রাঁষ্ট্রে তৈরি

মেসিনগানে। তোমরা তো জীবিত। কত অসহায় চাষী-মজুর আঘাতলি দিয়েছে কেবল বাঙালী হয়ে জন্মানোর অপরাধে। নিশ্চিহ্ন কত পরিবার। শশানচরে যৃত ছাড়া কাঠো মুখ খুঁজতে যেয়ো না। অমঙ্গল হয়।...

গাজীর হঠাতে মনে পড়ে, অসহায়তা প্রাচীন সংক্ষারের দিকে মাঝুষকে টেনে নিয়ে যায়। যেখানে আবেগের নিরাপত্তা, সেখানেই অর্গের কলনা। তাই বোধ হয়, ভোগোলিক বক্ষনের বাইরে অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত। অথচ একটি গৃহাঙ্গন, মধ্যবিত্তের সাধারণ শহরে জীবনযাপন, এবং টবে তৈরি ছোট বাগান-সমষ্টি—তাকে আর রেহাই দিচ্ছে না! ধাবমান বাসের সঙ্গে হরিং-সমৃদ্ধ থই থই বাংলাদেশের জনপদ প্রান্তের তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। অথচ গৃহনীড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা^১ কত বছর ধরে কত বার না গাজী রহনান ভেবেছে! আজ এমন স্মৃযোগের মুখে সে গৃহাগতপ্রাণ, যদিও সচেতনভাবে নয়। কিন্তু নিজের বোধের উপর দাগাবাজি অসম্ভব। যতই নিঃসাড়তায় মন হেয়ে যাক, ভাবমূর্তির জুলুম নিরবচ্ছিন্ন, একটানা।...উঠানের একটা ফুলগাছ তার উপর হৃষড়ি থেয়ে পড়ল কিছু বলার উদ্দেশ্যে। গাছ নয় একদম মাঝুষ। পাঁপড়ির উপর সন্তানেরা বসে আছে, যখন প্রতিবেশী কষ্ট তাদের ভাক দিচ্ছে এক পার্টির আয়োজন সম্পন্ন করতে। লন, গান, ভাঙা দেওয়াল, কয়েকটা বেওয়ারিশ ঝুকুর, স্টার্ট-বিমুখ মটোরের কুস্তন-আওয়াজ, পুলিসের ছাঁইসেল, বিদেশী রেকর্ডে ‘আভামারিয়ার’ একটানা সুরেলা খনি, পিণ্ডিশাহী ধূস হোক, শ্লোগানে শ্লোগানে বিধ্বস্ত মানচিত্র। এই নরক থেকে আমি মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি...মাঁই বেকসুর হুঁ...আমি নিরপরাধ, শুনে রাখো বেজন্মা বজ্জাতের দল...একদল হিঙ্গড়ে সঙ্গিনের সামনে করজোড়ে প্রার্থনারত.....খামোকা বিবেকের লড়াই.....

গাজী আবার বাসের জানালার শিক অজ্ঞানতেই চেপে ধরেছিল। কেবলমাত্র মূক থাকার জন্মেই কি তার এত অরসাধনা? এই

সংগীত, এই কাহ্না, ধনির এমন বিচার, রাগের মেজাজের অনুধাবন !
সবই তো দেখা যায় শর্তার বাহন। নচেৎ সে কেন চৈৎকার
দিয়ে উঠল না, “ম’ই বেকনুর ছ”, অথবা অপরাধের শীকৃতির জন্য
কষ্ট বিদীর্ণ করে বললে না, “আমি তোমাদের ধংসের জন্মেই বাঁচব।
মিথ্যের বেসাতির দল, বঞ্চনার মসনদ থেকে তোমাদের গর্দান
ধূলোয় লুটোক অথবা কালনেমির মুণ্ড বঞ্চনার মসনদেই আবার
ফিরে যাক, তার জন্মেই আমার জীবিকা। আমার অর্ধভূত
দেশবাসী তোমাদের হাতে অন্ত সাজিয়ে দিয়েছিল দেশরক্ষার জন্য,
আজ কৃতপ্রয়োগের মত তাদের ধৰ্ম করছ ছলনার পাশা খেলে। যা
তোমাদের স্বার্থরক্ষী তা-ই ইসলাম। যা করাচী, ইসলামাবাদকে
বকুমকে রাখবে তা-ই পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা...বেইমানের
দল...দূর হও অথবা ধৰ্ম হও !”

তোক গিললে গাজী রহমান, কি যেন তার গ্রীবায় আটকে গেছে,
সহজে নামছে না। শুন্ধ সৌট ছটোর উপর চোখ পড়তেই তার
বুক ধূক করে উঠল। ওই দু’টি জোওয়ান ছেলে হয়ত আর বাড়ি
ফিরবে না। অশেষ নির্যাতনের কাহিনী নিপীড়কদের বাইরে,
কারাগ্রামকোষ্ঠ শুধু জানবে। এই যমালয় থেকে কবে মুক্তি পাব
আমি ? কবে মুক্তি পাবে বাংলাদেশ ? প্রশ্ন এখন সোজাসুজি খবড়া
হয় না। ছেঁচা স্বায়ুদল থেকে নির্গত শব্দের আকারে চিষ্টাণ্ডলো
অসংলগ্ন, তবু জানান দিয়ে যায়। ওই দুই সৌটের উপরকার
শুগুতা গাজী রহমানের দিকে যেন এগোতে থাকে এবং তাকে
যখন ধিরে ধরে, সে তুল্কালাম আজ্ঞাধিকারে মস্ত হয় : ভীরু,
কাপুরুষ, না-মরদ। প্রতিকারের মুহূর্ত পেরিয়ে গেলে সব কর্তব্য,
বিশ্বেষণ হিজড়ে-কীর্তনে পরিণত হয়। তা গাজী রহমানের চেয়ে
কে আর বেশী জানে।

নেপথ্য ফিসফিস ধনি আবার কানে এসে পড়ে না শুধু, শব্দের
উৎস-ভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার আকর্ষণ পর্যন্ত রাখে। তা গাজী
রহমানের জন্য কিছুটা স্বত্ত্বালম্বন। অস্তত আস্তসংগ্রামের বৌরা

ଶ୍ରୀରାମକାଣ୍ଡିକା ହୟ ।

—କହିଲୋ ବଡ଼ । ହେବ ମା ଆହେ ନା ?

—ତା ନଇଲେ ପରଦା ଅଇଲ କ୍ୟାମନେ ?

—ଆହା ମାରେଓ ପଥ ଚାଇଯା ଧାଇକବ ।

—ଏଦେର ମାରବ ନାକି ?

—ମୋଡ଼ାତାଜା ଶରୀର । ରଙ୍ଗ ସବ ନିଯା ନିବୋ । ତହନ ଆର କି ଦିଯା ବୁଝିବ ? -

—ରଙ୍ଗ ଲୟ କ୍ୟାନ ?

—ଆସ୍ତେ କଥା କଉ, ମିଯା ।

ଶବ୍ଦେର ଉଂସଭୂମି ଏବାର ପରିଷକାର ଦେଖା ଯାଯ । ଦୁଇ ଶ୍ରୋତ୍ର ଚାରୀ । ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବ ବେଶ, ଜୀବ ଦେହ । ପାଶେର ଦିକେ ସୀଟେ ବନ୍ଦେ ଆହେ ।

ଗାଜୀ ରହମାନେର ଇଚ୍ଛା ହୟ, ସେ ନିଜେର ଗୌବା ଦୁଇ ହାତେ ଟିପତେ ଟିପତେ ଓଦେର ସମ୍ମୁଖେ ଗିଯେ ଦାଡ଼ାୟ ଏବଂ ଆଦେଶ କରେ “ତୋମରାଓ କଥା ବଲତେ ଭୟ ପାଓ ? ତୋମରା ଅଶିକ୍ଷିତ, ଦୁରିତ୍ର । ଆର ଆମିଓ ବହୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଜନେର ପର ତୋମାଦେର ଖୁଟାତେଇ ବୁଧା ରମ୍ଭେଛି । ଆମାକେ ଖୁନ କରୋ । ଅପଦାର୍ଥ, ଭୀର... । ଗଲା ଟିପେ ଆମାକେ ଖୁନ କରୋ, କରୋ... । ବାଲାଇ ଘୁଚେ ଗେଛେ । ମୂର୍ଖ ଆର ପଣ୍ଡିତ ସମାନ ଓଜନ । କାରଣ, ବିବେକେର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଉବେ ଗେଛେ । ତାଇ ସକଳେ ସମାନ ପଲ୍କା, ଭାରହିନ । ଏହି ନରକମୁକ୍ତିର ଲଘୁ କବେ ଆସବେ ?” ଗାଜୀ ରହମାନେର ନିକଟ ନିମେଷେ ସବ କିଛୁ ଅର୍ଥଶୃଙ୍ଖ ଅଭିଭାବ ହୟ ।

ଶ୍ରୀ-ପୁତ୍ର-କଞ୍ଚା—ଯାଦେର ଜଣେ ଏକଟୁ ଆଗେ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ-ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରଛିଲ, ତା ଆର କୋନ ଆବେଦନ ରେଖେ ଯାଯ ନା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଲଞ୍ଚଭଣ୍ଡ । ଆଦିଗନ୍ତବିନ୍ତୁତ ଯୁତ୍ୟର ସଡ଼କ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦିଖ୍ୟେତା ଏହି ରାଜ୍ୟେ ବେଚପ ଦୟନିର୍ଗତ ହାସିର ପରମ ଠାଟା । ପାଗଲେର ମତ ହେସେ ଉଠିତେ ପାରଲେ ହୟତ ସବ ଗମୋଟ କେଟେ ସେତ । କିନ୍ତୁ ହାସିର ସଂଜ୍ଞା ଗାଜୀ ରହମାନେର କାହେ ଦେଡ଼ ମାସ ଅଜ୍ଞାତ । କିରଣ ରାଯ ଏବଂ ରେଜା ଆଲିର ସାହଚର୍ଯ୍ୟେ ସେ ପ୍ରାଣ ଖୁଲେ ହାମେନି । ରମିକତା ଦିଯେ ହୁଅ ଚାପା

দেওয়ার হনিস তারা জানে। রেজা আলির মুখ্যবয়ব কত গভীর। তিনিই শুহুদসংসর্গে বিদ্যুক। কুরুক্ষেত্রে পাঞ্জগন্ত-বাদকের পক্ষেই বৃন্দাবনলীলা সম্ভব। গাজী রহমানের লড়াই ছিল বারো আনা মগজের ব্যাপার। তাই সহসা-আঘাতে হতবৃক্ষ। যন্ত্রণার মোড় মুহূর্তে মুহূর্ত দিক বদলায়। এই চকিত অপ্রস্তুতি পাঁজুর ধরে টানে, রক্তের চলাচল বন্ধ করে দেয়। চোখ আর দেখে না। ওই তো ধাবমান বাসের সঙ্গে দৌড়িরত মোহিনী বাংলাদেশের জনপদ, তরঙ্গ-সম্বৰ্ধ, ঈষৎ জমাট মেঘ, বস্ত্রবিরহিত ফালি ফালি রঙ, গগন-প্রাণে কোলাকুলিমন্ত্র জনপদ, মেঘ, নদী। সকলেই আকর্ষণ-ক্ষমতারিক্ত। অথচ চৈতন্যের দরজায় কেউ আত্ম নয়। বিশ্বস্ত দৈনন্দিনতা সহশক্তি অপহরণ করে। দেড় মাস নিয়মিত আহাৱ-নিজার সঙ্গে পরিচয় নেই। তার চেয়েও মারাত্মক মিনিটে মিনিটে প্রাণভীতি। কলিজার ধূকধূকানি একেবারে খেমে থায় না কেন? আর কোন বালাই থাকত না। একটি আঘাত পরিত্রাণ ঘটত। কিন্তু দেশ মাঝুৰ কি রয়ে যেত না? এই অবশেষই তো জীবনের গতি সচল রাখে। বাস্তুর মৃত্যু ঘটে, মানবগোষ্ঠী বিনষ্ট হয় না। গাজী রহমান হঠাতে তেজপ্রাপ্ত, নিজের সঙ্গে বেশ যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করেছিল। সুতরাং তার যন্ত্রণার অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছে তাদের যন্ত্রণার জ্বেল মিটবে না। এমন পক্ষপাত-বিশিষ্ট মানসিক গঠনই কি তার সারা জীবনের সাধনার ফল! নিজেকে সে প্রত্যারণা করেছে অথবা যথাদীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি। তঙ্গামির মুখোশ খুলে পড়ে ত্রাস্তিকালে। আসলে ছাপোষা মধ্যবিত্ত প্রবীণ শিক্ষক মাত্র সে। তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তবে কি নিজেরই কল্যাণ-কামনা? নিজের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল গাজী রহমান। হয়ত একটা বোঝাপড়া হতো। আহ! কিরণ রায় কি রেজা আলির সংসর্গ-ছাপ তার উপর অসে' যেত। কিন্তু তখনই আর একদিক থেকে নোঙ্গা পড়ল।

—স্তার?

ଆଚମକା ଛାତ୍ରେର ଡାକ । ଲେ ତୋ ହୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଶିକ୍ଷକ ନୟ । ତବୁ ଜ୍ଵାବ ସ୍ଵତଃକୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ମତ ବେରିଯେ ଥାଏ, “କି ?” ଅଶ୍ଵକର୍ତ୍ତା କେ, ତା ଜ୍ଞାନାର କଥା ତୋ ଗାଜି ରହମାନ ଭାବେନି ।

“ଶ୍ରାବ”, ଫିସଫିସ ଶବ୍ଦେ ଜ୍ଵାବ ଏଇ, “ଶ୍ରାବ, ଆମାଦେଇ ନାମତେ ହବେ ।” ସୈୟଦ ଆଲି ଏତ୍ତେଳା-ଦାତା ।

—ଆଜିଛା ।

—ଆପନାର ବ୍ୟାଗ ଆମାର ହାତେ ଦିଲ ।

—ସାମାଜିକ ଖୋଲା ଆମି ନିତେ ପାରିବ ।

—ତା ହୟ ନା, ଶ୍ରାବ ।

ଶେଷ ସହୋଧନେ ଚକିତ ହେଁ ଓଠେ ଗାଜି ରହମାନ । ବାଲେ ଆର କେଉ ଶୁଣିଛେ ନା ତୋ । ତାର ମତ କୁନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀକେ କେଉ ଶ୍ରାବ ଡାକବେ କେନ ? ମନେହ ଜାଗତେ ପାବେ । ଶିକ୍ଷକତା ତାର କାହେ ଅତୀତେର ବ୍ୟାପାର । ଆବାବ କେନ ଓହ ସହୋଧନ ? ବୀଚାର ଜଣେ ଏଖାନେଓ ମିଥ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ଆପମ । ନପୁଂସକେର ପ୍ରେମାକାଙ୍କ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅକୃତିମ ସତ୍ୟ ।

সঙ্গী আরো হই ভজলোক। একজন পাতলা ফরসা চেহারা। চোখে চশমা। শিক্ষক, সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবী মনে হয়। ময়লা লুঙ্গি এবং পিরান মাছুষটাকে চাপা দিতে পারেন। অগ্রজন বেঁটে, বেশ গোলগাল চেহারা। কর্মকুশলতার ছাপ তিনি দিনের দাঢ়ি ভেদ করেও বেরিয়ে আসছে।

এরা কারা?

তাই সন্দিক গাজী রহমান সৈয়দ আলিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়। কিন্তু সে স্বয়েগপ্রাপ্তির আগেই মজুর ব্যক্তি তাড়া দিলে, “আপনারা যদুর সন্তুষ্ট জোরে হাঁটেন। তবে দৌড়াবেন না।”

সৈয়দ আলি লহা লহা ঠ্যাং ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। বাকী তিনজন অহুপদী। কেউ পেছনে পড়ে নেই। কিন্তু গাজী রহমান সৈয়দ আলিকেও ছাড়িয়ে গেল। জায়গাটা সে দেখে নিলে। বাঁধের উপরকার পাকা রাস্তা ছেড়ে নৌচে নেমে গ্রাম-পথ ধরতে হয়েছে। সামনে দেড় মাইল মাঠ। তারপর গ্রাম-সীমানা আরম্ভ। ডহর এলাকা। মাঝে মাঝে সরু খালের রেখা এখনই দেখা যায়। চারিদিকে জলাভূমির প্রাধান্ত। রাস্তা কখনও শুকনা, কখনও কাদা। সকলের পরনে লুঙ্গি, জুতা হাতে। সুতরাঃ হাঁটার কোন অস্থিবিধি ছিল না। ফরসা ভজলোক সঙ্গে ছাতা নিয়েছিলেন। বগলদাবা হাঁটছেন। হঁৎক করছেন বেশ। অর্ধাঃ এমন পথহাঁটা অভ্যসের বাইরে।^১ কিন্তু সৈয়দ আলির নির্দেশে সকলে অতি সক্রিয়। গাজী রহমান সকলের দশ-বারো হাত অগ্রগামী। পদ্বর্জনের সঙ্গে তার যে খুব পরিচয় ছিল, তা নয়।

কিন্তু আজ সে অমুপ্রাণিত। বিরাট মাঠের মধ্যে চারজন প্রাণী। লোকালয়ে না পৌছলে আর মাহুষ দেখা যাবে না। মাঠে কাজকর্মরত একজন চাষীও নেই। সাত-আট দিনের মধ্যে পেকে যাবে, এমন ইরিধানের ক্ষেত্রে পড়ল ছ' পাশে। অনহীনতার, বোধ হয়, এই একমাত্র কারণ। মাঠে কাজের কোন স্থূল্যোগ নেই।

সৈয়দ আলির তাগিদ সকলকে আচ্ছাদন রেখেছিল। প্রথমত, পরিচয়ের গা নেই কারো। আরো জোরে জোরে ইঁটা আলা-পচারিতার অঙ্কুর নয়। গাজী রহমান নিজের ভেতরে গেঁজা। তার বেরিয়ে আসার কোন আগ্রহ নেই। অপর দুইজন কী উদ্দেশ্যে সঙ্গী, জানা না-থাকার ফলে তার সন্দেহপ্রবণতা বার বার চাড়া দিয়ে ওঠে। একপাশে সৈয়দ আলিকে ডেকে জিজেস করে নেওয়া যেত। কিন্তু সে বার বার যেভাবে পেছন দিকে তাকাচ্ছে আর ঠ্যাং ফেলছে, আশঙ্কা হয়, কী যেন তাকে স্বাভাবিক ধাকতে দিচ্ছে না। আর সৈয়দ আলি কে, তা-ও তার কাছে অস্ত্রাত বললেই চলে। রেঙ্গা আলির বিশ্বস্ত চেনা লোক। এটুকুই ভরসা। অনিশ্চিত গন্তব্যের ধার্কা কিন্তু এতটুকু গাজী রহমান অনুভব করছিল না। এই নরকে যেভাবে দিন গুজরান, তার চেয়ে যেখানেই গিয়ে পৌছাক না কেন সে, এত যন্ত্রণা ধারবে না অস্তুত। দেবতার না হোক, মাহুষের বাসযোগ্য হবে বৈকি তেমন এলাকা। নিঃস্থানের তেজী-মন্দীর খেল অহরহ—এমন ব্যবসা থেকে অস্তুত সে রেহাই পাবে। কাজেই ছই পা মনের সঙ্গে সমানভাবেই অমুপ্রাণিত। যদিও ক্লাস্টির ছাপ মুখে। গাজী রহমান সকলের আগে যেন দোড়তে পারলেই আরো খুশী হয়। সৈয়দ আলির নির্দেশনামা তাকে নিরুত্ত করে রেখেছিল।

কুড়ি মিনিট কি জোর পঁচিশ মিনিটে তারা পথটুকু অতিক্রম করে এল। সৈয়দ আলি কৃশ শরীর, কিন্তু পোড়-খাওয়া, হাতে আবার ব্যাগ। তবু সে বাজি জিতেছিল আগে। শেষ পর্বত

গাজী রহমান তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি।

প্রথমে একটা পুরুরপাড় আর বাঁশবন সামনে পড়ল। ওপারে গেরস্থ চাবী-বাড়ি। পাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা আছে জনপদের আরো ভেতরে যেতে।

সৈয়দ আলির ফরমান শোনা গেল, “আর, আপনারা বাঁশবনের ওই পাশে চলুন, তাড়াতাড়ি আসুন আমার সঙ্গে।”

পুরুরের পাড় একদম খটখটে শুকনা। খেবড়ে বসে পড়ল গাজী রহমান। এত জোরে আর জীবনে কোনদিন সে ইঠেনি। অপর ছইজনও শিক্ষকের পথ অঙ্গসরণ করলে।

বিরিবিরি বাতাস বইছিল। সৈয়দ আলি বললে, ‘আপনারা জিরিয়ে নিন। বর্ডার এখান থেকে আট-ন’ মাইল।’

বর্ডার

আলিবাবা মন্ত্র উচ্চারণের পর এইমাত্র যেন রঞ্জন্তার দরজা খুললে। গাজী রহমান অকারণ পুলকের স্পর্শ অমুভব করে। একদম অপ্রত্যাশিত, গুরোট সরে যাচ্ছে কাছ থেকে। নার্ভগলো পর্যন্ত শুনেছে ‘বর্ডার’। আর তাই সতেজ হচ্ছে ক্রমশ।

গাজী রহমানের আর কোন সন্দেহ থাকে না সঙ্গীদের উপর। সকলেই এক বাধানের গুরু। পরিচয়ের খিল আর এঁটে রাখা অশোভন। জানা গেল, সঙ্গী দুঙ্গনই মাথায় ছলিয়া-খাড়া রাজনৈতিক কর্মী এবং মাইনরিটি। তাদের স্তৰ-পুত্রাদি আগেই চলে গেছে অন্য মুসলিম পরিবারের সঙ্গে। দুষ্প্রাপ্ত হৃদিপাকে পড়েছিলেন গ্রামে মিলিটারী হামলার সময়। পরে রেজা আলি এই ব্যরস্থা করেছেন।

সৈয়দ আলি অবিশ্বিত তাদের কথা যেন শুনছিল না, এমন ভাব। আরো কারণ আছে। ক্লাস্টিহর বাতাসে সংলাপ জমে উঠলে, সৈয়দ আলি, যেদিক থেকে তারা এসেছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে উচ্চারণ করলে, “দেখুন—।” বাঁশবনের আড়ালে তারা বসেছিল। তখনই উৎব্যগ্র দৃষ্টি ধেয়ে যায় তর্জনীর সোজাসুজি। তিন-

চারখানা মিলিটারী জৌপ, একটা বড় কেরিংয়ার বিকট শব্দ তুলে
পাকা রাস্তা পার হচ্ছে।

ফিসফিস এবার সৈয়দ আলির আওয়াজ, “শুব বেঁচে গেছি,
স্থার !”

তন্ম পেয়ে যায় গাজী রহমান এবং প্রশ্ন করে, “কেন ?”

“স্থার, সব তো খেয়ালের ব্যাপার। রাস্তা থেকে এই গাঁয়ের
ওৎ দেড় মাইলের কম নয়। চারজনকে একসঙ্গে দেখে—ধরুন এক
মাইল চলে আসার পরও—বদি হাকত, ‘এই ইথার আও,’ তখন
কী করতাম ? মনে রাখবেন, চীনা মেসিনগানের ক্ষণি দেড় মাইল
যায়। ফিরে যেতে বাধ্য হতাম। তারপর হয় ছেড়ে দিত জিঞ্জসাবাদ
করে, না হয় চোখে কালো ফেটি বাঁধত। কিন্তু এখানে আর না।”

সৈয়দ আলি গ্রামের আলপথে ওদের নিয়ে ইঁটিতে লাগল।
আবার উপদেশ দিলে সে, শদিগ অহুরোধ মলাট, “আপনারা
আর কোন কথা বলবেন না। গাঁয়ের ভেতর কেউ কিছু জিজ্ঞেস
করলে, আমি জবাব দেব।”

তার পরই একটু থেমে সে ব্যাখ্যা জুড়ে, “গ্রামে দালালরা
অনেক সময় খামকা হয়েরানি করে। আমার এই এলাকা মুখস্থ।
রাত্রে থাকারও জায়গা আ। ঘাবড়াবেন না।”

আগের উল্লিখিত নাবি বা ডহর এলাকা। অর্ধাং ডাঙার
চেয়ে জলের আয়তন বেশী। তাই এবার রাস্তার মোকাবিলা
বেশ ছুরুহ হয়ে উঠল। পথে কাদা। মাঝে মাঝে জল ভাঙতে
হয়। কাপড় অর্ধাং লুঙ্গি অবিশ্বি এই ক্ষেত্রে সমস্যার জন্য তোক্ষ।
কোমর পর্যন্ত তুলে যাও। তারপর পানী বদি কমে তুমিও নামাও।
মাঝে মাঝে পচা কাদার গন্ধ বমির উদ্রেক করছিল। কিন্তু নাকের
ঝাঁঝকি তখন বড় কথা নয়। তাই উচ্চবাচা থেকে সকলেই দূরে।
চিরাচরিত পল্লীকী চোখের নিকটে ছুটে আসে। কিন্তু মেহনত এত
বেশী যে কারো চোখ আর নিরীক্ষণে এগোয় না। সৈয়দ আলি
আরো বলেছিল—বর্ডার এলাকার পাঁচ মাইলের মধ্যে সাঙ্ক্ষ

আইন জারী হয় সুর্যাস্তের পর। অতএব দিনের আলোর সম্বৃহার একান্ত দরকার। অবিষ্টি মাতৈঃ বাণীও ছিল সঙ্গে। এইরকম পচা জায়গায় কে তদারকে আসবে? সুতরাং ধারভাবেন না। কেবল আলো সম্পর্কে একটু সাবধান হলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

এবার কিন্তু ঘন সক্র খাল পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও শ্রোত আছে। তেমন ডহর নয়। তাই এখনও চরম অস্থুবিধার সম্মুখীন কেউ নয়। বার বার সাতার দিতে হলে শেষ পর্যন্ত উদ্যম ফুরিয়ে যেতে পারে। সৈয়দ আলি ছাড়া আর সকলেই প্রৌঢ়। গ্রামের লোক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। সৈয়দ আলি হঁশিয়ার ছেলে বটে! নিকটস্থ বহু গ্রাম এবং অধিবাসীদের চেনে। তাই হয়ত প্রচলন দালালও তাদের ধাঁটাতে সাহস পায় না। সৈয়দের অবাব জবাব নয়, হাতুড়ি ঠিক পেরেকের মাথায় গিয়ে পড়ছে।

এক জায়গায় তারা বেশ ঠেকে গেল। সক্র খাল। আর একটু সংকীর্ণ হলে লাফিয়ে পার হওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। হঠাৎ ঝুঁকি গ্রহণের ফল, কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে। তখন হাঁটা শুধু শ্লথ হবে না, কষ্টের পরিধি এমন বাড়বে যে, সাক্ষ্য আইনের কবলে পড়ার আশঙ্কা। তবে উপায় হয়ে যায়। একটা ডোবানো ডিঙির পানি ছিঁচে তারা পারযোগ্য করে তুললে।

গাজী রহমান কিন্তু ক্লাস্টির কথা আর্দ্দে ভাবেনি। সে যেন খোলস ছাড়ছে। বসন্তের বাতাসকে সাপ এই অবস্থায় নবদেহে তেজের কোমল স্পর্শ মনে করে এবং তাই চঞ্চল এদিক-ওদিক ছোটে। গাজী রহমানের তেমনই অস্তুভব। ধামে শরীর নেয়ে গেছে, কিন্তু তার পদক্ষেপ অব্যাহত আছে। অবারিত গগনের নীচে এই জনপদের মধ্যে একগুচ্ছ প্রাণী পরিমাপে কড় ছোট। অর্থ তাদের কামনা, আবেগের বিস্তৃতি হাজার হাজার মাইল জুড়ে। দেশ-দেশান্তর, গৃহ-গৃহান্তর, ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমাবোহের উপর কী প্রবল গতিতে না আছড়ে পড়ছে এবং তখনই অঙ্গ অবলম্বনের

অঘেৰায় হয়ে হয়ে ছুটছে। নিসর্গের পটভূমি এখানে অবাস্তৱ
হয়ে যায় না, তবে তার প্রতিবেদন স্তুক থাকে। গাজী রহমান
কি অজ্ঞত আনন্দের সঙ্গে দেখত না, ধানবনের গোড়ায় জমা
পানির পাশে চরের অভিমুগ ইষৎ ডাঙাৰ উপর দিয়ে কীভাবে
শামুক বা গুগলি হাঁটে? বিশেষত এমন চলাফেরায় মাটিৰ উপর
যে সব দাগ পড়ে, দাগ অথবা রেখা, তা-ও আদিম মাঝুৰে ছবিৰ
সঙ্গে অনেক সময় মিলে যায়। এই সামৃদ্ধ প্ৰকৃতিৰ অহৰহ নকশা-
হীন ঘূৰ্ণি-বুদ্ধুদকেও রেহাই দেয় না নিয়মেৰ আওতা থেকে। নিৱস্তৱ
পৱিবৰ্তন প্ৰবাহণ প্ৰ্যাটার্নেৰ ছাপ রেখে যায়। অন্ত সময় এমন
সব চিষ্ঠা গাজী রহমানেৰ মনে দেখা দিত। আজ পথ চলাই
তার কাছে একমাত্ৰ সত্য। আৱ প্ৰাণভীতিৰ জুলুম অত নেই।
কিন্তু বিপদেৰ আশকা এক একবাৰ টুঁ মেৰে যাচ্ছিল। সঙ্গে
হুই ভজলোক খুব সোয়াস্তি নয়। দাগী সৱকাৰী আসামী।
বিৱৰণতা পোষণ এমন ক্ষেত্ৰে স্বাভাৱিক। কিন্তু রাস্তাৰ ভিজে এবং
কোথাও কোথাও গা-ঘৰঘিৰ চেহারা, বহু অবাস্তৱ বা সংগত চিষ্ঠা
শুধৰে নিছিল। পাশেৰ এক ভিটেৰ উপৰ কৌতুহলী ছেলেমেয়েদেৰ
দিকে একটু তাকায় না গাজী রহমান। চাৰজনেই নিঃশব্দে হাঁটছিল
সেদিন। কৌতুহলী বা হুৰভিসক্ষিমনা ব্যক্তিৰ জবাবণ দিতে হয়।
ফলে, চলায় ব্যাঘাত ঘটে। ঝোগ-ঝাড়, কলমিলতা বোঝাই ছিপ-
ছিপে জলো মাঠ, সুৰ আলপথ, রক্তদৰ্শী ভাঙা শামুকেৰ খোলা,
হাঁটু-পানিতে ঝপঝপ পা ফেলাৰ শব্দ, আঘাটাৰ অঙ্গুৎসাহ, নড়বড়ে
সাঁকোৱ ধৰ্ণিহীন সম্বোধন, জলচেঁড়াৰ পিঙ্গল সতৰ্কতা, হঠাৎ-
হঠাৎ পানকৌড়িৰ উড়াল ও শিশু-বলত পালাক্রমিক ডোবা-ভাসা,
শাপলাৰ রগৱেগে ইঙ্গিত—এমন লীলাপট তো নিৱস্তৱ অতু-বদলেৱ
সাক্ষী, পৰ্যটকেৰ প্ৰাণিহৰ নয়নাশ্রয়। আজ বিপৰ্যস্ত চাৰজন তখন
কেবল একটি নোকাৰ জন্মে আগে থেকেই চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখছিল।
এই লোকালয় ইষৎ ঘনবসতি, পথ খটখটে ডাঙ। কিন্তু আৱ
যাওয়াৰ উপায় নেই। সামনে কঢ়েক মাইল জুড়ে বিলেৰ প্ৰসাৱ।

এত বিস্তৃত জল ভেঙে গন্ধযো পৌছানো ছঃসাধ্য। তা ছাড়া, এই বিল
মাঝে মাঝে এত ডহর যে সাঁতার পারার্থীর একমাত্র উপায়।
কিন্তু অনিচ্ছিতা এখানে বাধা। কতক্ষণ সাঁতার দিতে পারে
একজন?

ভিটার নৌচে দূর্বা ঘাসের উপর তারা বসে পড়ল। নৌকা
ছাড়া গতি কোথায়? সুতরাং অপেক্ষা করো। ওদিকে বেলা
ঢলে আসছে, তা আশঙ্কা আরো বাড়িয়ে তোলে।

কয়েকজন গ্রামবাসী এসে পৌছল। জিজ্ঞাসাবাদ চিরাচরিত
ব্যাপার। এই সময় দেখা গেল, লাঠির সাহায্যে এক যুবক খুঁড়িয়ে
খুঁড়িয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গাজী রহমান
কিছু তাগদ ফিরে পেয়েছিল। যুবকের দিকে সে তাকায়। আখাস্থা
জওয়ান, চওড়া হাড় আর গতরে এই পল্লীর মধ্যে এমন চেহারা
চোখে পড়ার কথা নয়। আরো গ্রামবাসী এসে জুটছিল। নৌকার
বন্দোবস্তের জন্য তারা বেশ সহজেয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জওয়ান ছেলেটা লাঠির উপর ভর দিয়ে তাদের
কাছে এসে দাঁড়ায়। গাজী রহমান নৌকার কথা আপাতত আর
তুলতে চায় না। আশঙ্কা অনেক কিছু। তাই মনের মোড়
ফেরাতে সে সৈয়দ আলির নির্দেশ ভুলেই জিজ্ঞেস করে বসল,
“নাম কী বা-জী?”

—আলম।

—বয়ো, বয়ো।

কিন্তু সে বসলে না দেখে গাজী রহমান শুধায়, “পায়ে কী
অইছিল?”

“গুলি লাগছে।”

“গুলি?”

“হ।”

“গুলি করছিল কেড়া?”

যুবকের কষ্ট থেকে সরাসরি ঝাঁজ উদ্গীর্ণ হয়, “আপনে জিগান,

ଶୁଣି କରାଇଲ କେଡା ?”

“ହଁ ।”

“ଆପନେ ବୁଡା ମାନୁଷ ଆଜିଓ ଜାନେନ ନା, ଶୁଣି ଆବାର କୋନ୍‌ହାଲାରା କରବ ?” ଓଇ ପାଞ୍ଚାବୀ—” ତାର ପରଇ ସେ ଏକଟା ପଚା ଖିଣ୍ଡି ଜୁଡ଼ିଲେ ।

ଗାଜୀ ରହମାନ ଏଦିକେ ବଡ଼ ଧୋପହୂରଙ୍ଗ । ଖିଣ୍ଡି ତାର କାନେ ଗେଲେ ଅନେକଙ୍ଗ ଜେର ଚଲତ । ଆଜ ତେମନ କୋନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୟ ନା । ବରଂ ଆରୋ ସହଜ ଗଲାଯ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, “ଆହା, ଏମନ ଖୁବଶୁଣନ ଜୋଯାନ-ପୋଳା ତାରେ ଅକେଜୋ କଇରା ଛାଡ଼ିଲ ।”

ଆଲମ ଏହି ସହାହୁତ୍ତତିର ପାଲଟା ଦିଲେ ଈବଂ ଭର୍ତ୍ତନାର ସ୍ଵରେ, “ଓ କଥା ମୁଖେ ଆନେନ ନା । ଡାକ୍ତାରବାବୁ କଇଛିଲେନ, ହୁ-ତିନ ହଣ୍ଡା ଲାଇଗବ ମାରତେ ।”

ମନ୍ତ୍ରିଇ ଆଲମେର ଜଖମ ଖୁବ ଶୁରୁତର ନୟ । ରାଇଫେଲେର ଶୁଣି ସବୁ ମନ୍ଦିରୁତ ଗତି, ତଥନଇ ପାଇୟେ ଏସେ ଲେଗେଛିଲ । ଅବିଶ୍ଚିତ ତାର ଆଗେ ବହୁଜନ ଧରାଶାୟୀ ହୟ ।

—ଶୁଣି ଅଇଛିଲ କୋଥାଯ ?

—ଆମାର ମାନୁର ଗୁରୁ !

ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରାମବାସୀରା ସବ ଘଟନା ଜାନେ । ତାରା କିଛୁ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେଓ ଆଲମେର ମୁଖେର ଦିକେ ଚୟେ ଥାକେ, ଯଦି ଆବାର ଶୋନା ଯାଏ ।

ଗାଜୀ ରହମାନ ଜିଜ୍ଞାସା-ଅଜିଜ୍ଞାସାର ମାର୍ବଧାନେ ଅବଶ୍ଯାନ, ମୁଖ ଖୋଲେ, “ତୋମାର ମାମାବାଢ଼ି—”

“ଆଜିମଗଞ୍ଜ ଏଲାକା ।”

“ଓ— ।”

“ଶୁଣି କବେ ହୟ ?”

“ହିସାବ କରଣ ପଡ଼େ । ତହନେ ବ୍ରଜବାଣିଯା ମୁକ୍ତିକୌଜେର ଦର୍ଶଳେ ଆଛିଲ ।”

“ବାରୋ-ତେର ଏଗ୍ରିଲ ହବେ !”

“সাব, আমরা তো আর হিসাব রাখতে পারি না।”

“তা যা-ই ওক্ত, কী অইছিল ?”

“আপনেরে কওয়া লাগে”, এই উচ্চারণের পর ঘূর্বক ঈষৎ মুখ বিকৃত করলে। ঘেহেতু আঘাতের জায়গায় কিছু যন্ত্রণা ইচ্ছিল। একটু হাঁফ ছেড়ে সে মাটির উপর বসে পড়ল। বাম পা একদম সোজা করতে পারে না। একটু বাঁক থাকে ইঁটুর কাছে।

আলমের মুখ স্বাভাবিক হতে বেশী সময় যায় না। বিলের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে সে বললে, “সাব, ঘরে বইস্থা আছি, এই দুঃখে আর বাঁচিনে।”

—ক্যান, মিয়া-বাই !

—লড়ায়ের অঙ্কে (সময়ে) জওয়ান মানস্বের কাম ময়দানে।

—তা ঠিগ্।

সায় দিয়েছিল গাজী রহমান।

আরো মাঝুষ জুটে যায়। বিকালে অনেকে কাজকাম থেকে ফারাক, আজ্ডার মৌতাত-সন্ধানী।

আলমের মুখে বয়ান শোনা গেল।

ঘটনা ঘটে আজিমগঞ্জ এলাকায়। সেদিন ভোর হয়েছে মাত্র, আবছা আলোয় দেখা গেল, পনর জন রাইফেলধারী পাঞ্চাবী সৈন্য জেলা বোর্ডের সড়কের উপর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে। তখনও আঙ্গুলবাড়িয়া এলাকা মুক্তিক্ষেত্রের অধীনে। সন্তুবত, কুমিল্লা ক্যাটল্যান্ডেট থেকে এদের পূর্বে পাঠানো হয়েছিল। কোনু কারণে এই পনর জন মূল রেজিমেন্ট থেকে ছিটকে পড়েছে। মুক্তিক্ষেত্রের চাপের সম্মুখেও এই ব্যাপার ঘটতে পারে। সন্তাননা নিয়ে মাথা ধামিয়ে লাভ নেই। এই এলাকায় বিছানের অঙ্কে তারা পনর অন হাঁটছিল। গ্রামবাসীদের ঘূর্ম তখন কারো ভেঙেছে বা কারো ভাঙেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটনা একজনের কাছে জানা হয়ে গেল, তা বিছানবেগে শত শত মাঝুষকে ছুঁয়ে যেতে লাগল। যাদের সকালে বিছানায় পড়ে থাকা সাবেক অভ্যেস, তারাও আর কাঁথার

উমে বল নয়। ধড়মড়িয়ে উঠল না শুধু, হাতের সামনে যা পেলে, বাঁশ, কোচ, লাঠি—তুলে নিয়ে সড়কের দিকে দৌড় দিলে। চারিদিকে ধাইতে লাগল। মিলিটারী হাজারের পুঁ গাঁয় ঢুকছে। সূর্য সবে-মাত্র খাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শত শত শোক মিলিটারীদের পেছন পেছন হাঁটছে, গুলির লক্ষ্যের বাইরে। একদিকে হাতিয়ার অতি হালফিল রাইফেল। অগ্নিদিকে মাঝাতা আমলের লাঠি। সূর্য উঠছে। ওদিকে জনতার ভিড় এবং উত্তেজনা সমান তালে বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে আগে মিলিটারীরা হাঁটে, পেছনে অস্মসরণ-রত জনতার দঙ্গল। দুই দিকে শব্দের তেমন ঘটা নেই। বুটের আওয়াজ জনতার অমুচ রবে ঢাকা পড়ে যায়নি। কিন্তু এই উত্তাল অবস্থার ভেতর দাহমান মানসিক উপাদানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। হঠাতে শ্লোগানে সকালের শুস্ত পৃথিবী সচকিত হয়ে উঠল :

“জয় বাংলা, জয় বাংলা।”

“বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ।”

“শেখ মুজিব জিন্দাবাদ।”

“মৌলানা ভাসানী জিন্দাবাদ।”

দিনের প্রারম্ভ। কিন্তু মনে হয়, উত্তেজনা যেন সমাপ্তির সড়কে এইমাত্র পা রাখলে। আর শতে শতে নেই জনতা। হাজারে হাজারে। শুধু পাকা রাস্তা: পার্শ্ববর্তী গ্রাম নয়, আশেপাশে পাঁচ মাইল ছ' মাইল দূরবর্তী গ্রামের মাঝুয় পর্যন্ত ছুটে এসেছে। সকলে লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত। তখনও সৈন্যরা নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে। আর জনতা হায়দরী হাঁক হাঁকছে ছ' তিন শ' গজ দূর থেকে।

: জয় বাংলা।

: জয় শেখ মুজিব।

গ্রীষ্মের সূর্য আর সদয় নেই। এই তুমুল উত্তেজনার সঙ্গে এসে যোগ দিলে। শব্দও ক্রমশ তারাগ্রামের দিকে অগ্রসর। হাজার

হাজার মালুষের বজ্রনাদ কল্পন তুলছিল।

দশ বারো মাইল দূরে কুমিল্লা ক্যাটনমেন্ট। সৈগ্রাহিনীর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। কোন নিরাপদ আশ্রয়ও তাদের নিকটে থাকার কথা নয়। আর আশ্রয় হস্তস্থিত হাতিয়ার। কোনটার উপর তাদের লক্ষ্য বেশী ছিল, তা হানাদারেরাই জানে।

একক্ষণ মালুষ আসছিল দু' পাশ থেকে। এবার চার পাশ থেকে জনতা ছুটে আসতে লাগল। অবশ্যি কেউ কেউ খালি হাত। যে কিছু পায়নি, সে দশ ইঞ্চি ইট অন্তত চার টুকুরো করে দ্রুই ঢাতে নিয়েছে। রাইফেল বনাম পাটকেল। তবু লড়াই করতেই হবে। যুদ্ধ দেহি, যুদ্ধ দেহি। বাতাস ফিস্ফিস শব্দে সকলের কানে মন্ত্র দিচ্ছে। পঙ্গপালের মত গ্রামবাসীরা খেয়ে আসছে চতুর্দিক থেকে। খালবিল ঝাঁপিয়ে, ডহরডাঙ্গার কোন ভেদ না রেখে। গন্তব্য আসল। পথ যা-ই হোক। তের চৌদ্দ বছরের এক কিশোর এক হাঁটু কাদা সহ উপস্থিত। সোজা রাস্তা প্রয়োজন তার। পায়ে কাদা থাকলে কী লড়াই করা যায় না? বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে, থুঢ়ি, লাফ খেয়ে পড়তে পড়তে সে চীৎকার করে উঠল :

—জয় বাংলা

—বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ

—জঙ্গীশাহী ধরংস হোক।

যাদের হাতে লাঠি ছিল, তাদের অনেকেই অনুকরণ শুরু করে দিলে। যে বদুর পারে, মাটি থেকে উপর দিকে আকাশ-অভিসারী, তারপর বসুন্ধরার বুকে পদস্পর্শমাত্র হাঁক মারে : জয় বাংলা। এক হাতে এক ডঙ্গ ব্যাং ধরতে গেলে যেমন দিক-জ্ঞান থাকে না, যেহেতু ব্যাঙের লাফের উপর দৃষ্টি, তেমনই গন্তব্যের উপর চোখ থাকায় সবাই স্থানকালের কথা বিস্মিত হয়েছিল। এক ব্যক্তি ইট ছুঁড়তে লাগল মিলিটারীদের দিকে। পাঁচ শ' গজ দূর পর্যন্ত তার

ইট পৌছবে না, সেদিকে তার খেয়াল বেমালুম গায়ের।

হ' মাইল রাস্তা এইভাবে অজ্ঞানিতে জনতা এবং সৈন্য পার হয়ে এসেছে। কোন দিক থেকে এখনও চোটপাট শুরু হয়নি। কোলাহল এতক্ষণে সমুজ্জ্বলের রূপ নিয়েছে। চীৎকার, মন্তব্য, কথাকাটাকাটি—তারি মধ্যে হঠাত হঠাত ঝোগানের ঘতিচিহ্ন—অগ্নাত্ম শব্দের মনন চুরমার করে দিয়েছিল। বেসবুর যুবকেরা দৌড় মেরে গুলির রেঞ্জের মধ্যে ছিটকে পড়ে, বারণ শোনে না। এখানে অবিশ্বিক কেউ কারো কথার গোলাম নয়। বাইরের এত চাঁপ্লা, ফেটে পড়ার উদ্গ্রাতা, কিন্তু হাদয়কন্দর উৎসারিত, যেখানে শিল্পীর মত সকলে ভাবলেশহীনতার মৌন অভূতব করছিল। ঝোগান তার বাহ্যিক প্রতিরূপ নয়। গৃহবিবাগী উআদনাশষ্টির ক্ষেত্রে ঝোগান পদ্ধু। তার কারখানা এক মুহূর্হে চালু হয় না। দিন রাত্রি, অতীত বর্তমান, জ্ঞান-অজ্ঞান বহুদিন সক্রিয় থাকার পর তার সম্মোহ খলসে খলসে ওঠে। সুর্মা-পরার মত তখন যে-যার সাধ্যানুযায়ী তা চোখে তুলে নেয়। এই দৃষ্টিই কল্পনাষ্টি, যার মৌন এদের এত শব্দপ্রিয়তা এবং আকুলতা দান করে।

সূর্য তেতে উঠেছিল ক্রমশ। জোয়ান, কিশোর, প্রৌঢ়, এমন কী কয়েকজন বৃক্ষ পৃষ্ঠাত সম্মিল ছিল এই জনদেহের মধ্যে। এক আজ্ঞা। প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোমোর বস্তুকরার চতুর জরিপ করছে আহার্যের সংকানে। বিরাট। তার মধ্যে কুৎসিত কিছু আছে, তবু মহিমময়। তারই হস্তার প্রামবাংলার শাস্ত ছবি ফ্রেম থেকে খসিয়ে ফেলেছে। দুর্দম এই প্রাণশক্তির আলেখ্য শুধু চোখে ধরা যায় না। যারা শরিক, তারা যেন অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। আর দূরে অবস্থান-কারীরা দর্শকের মত তামাশা দেখে। তাই একত্রে শরিক এবং তামাশাদর্শী না হতে পারলে এখানে মুহূর্তের স্পন্দন অভূতব অসম্ভব। এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ, মরণাত্মের স্বরূপ বোধা যাদের কাছে আর নিষ্পত্তিজ্ঞ। প্রাণ দাও অথবা নাও। মাঝামাঝি পথ এখন কুন্দ। তাই কেবল গলা ফাটিয়ে সৈন্ধবের পিছু নিয়েছে কত

কিশোর। একদম রিক্ত হস্ত। হাতিয়ারের ধার সে ধারে না।
এই ঐক্যতানে ঝোয়ারী তারের প্রাথমিক ধাক্কাও বাঞ্ছবন্দের নিষ্পত্তি
কাপে সবাই বাজছে, রাগের ধর্ম বজায় রেখে বিস্তারের স্বাধীনতায়।

প্রৌঢ় এক চারী, হাতে তেলপাকা বাঁশের লাঠি, চীৎকার দিয়ে
বললে, “ভাইসব, আমরা কী হালাগো লগে ক্যাটনমেন্ট পর্যন্ত
হঁটিতেই থাকমু?”

অশ্ব সময়োপযোগী। সত্তিই তো, তারা কী শুধু অহুসরণার্থে
এত লোক ফজরে ফজরে কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে এসেছে! অশ্ব
সুতোর মত সকলকে জড়ায়।

“হাঁচা কথা!” নেপথ্যে কয়েকজন কোরাসে মন্তব্য করলে।

—আর দেরী না। বিসমিল্লা, কাম আরম্ভ করা যাক।

—অহনই!

—অহনই।

বেঠনী বৃহৎ যে যেদিক থেকে পারে সৈন্যদের ঘিরে ধরতে
লাগল। এতক্ষণ পনর জন বেশ হঁটছিল। অবিশ্বিত সম্মিলিত
শ্রেণীর তাদের সন্তুষ্ট করেনি, তা যাচাইয়ের পথ রূপ ছিল। কিন্তু
তাদের পদক্ষেপ শুধু দ্রুত হল না, টুগারে হাত প্রস্তুত রাইল।

—জয় বাংলা

—বঙবন্ধু জিন্দাবাদ।

—জয় মুজীব।

তৃতীয়বার ‘জয় মুজীব’ উচ্চারণের পর কিন্তু আর কেউ স্থির
ধাক্কা না। সামনের দিকে দৌড়ে এগোতে লাগল, হাতে যার-যা
অন্ধ সহ।

ফটুট.....

ফটুট.....

রাইফেলের গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল তখনই। জনতার ঘূর্ণতোড়
কিন্তু মন্দীভূত হয় না। চারিদিক থেকে গ্রামবাসীর হামলা। তাই
সৈন্যরা এদিক-ওদিক রাইফেলের নল ঘোরাতে বাধ্য। গুলির

আঘাতে কয়েকজন ধরাশায়ী, কয়েকজন আহত হামাগুড়ি নিয়ে
এই ভিড় থেকে এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। জনতা
লাঠি বলম বাঁশ কোচ ইত্যাদি নানা কিসিমের হাতিয়ার নিয়ে কিন্তু
পেছ-পা হচ্ছে না। আহতদের দিকেও সতর্ক নজর আছে অনেকের।
মাঝপাড়ার মজিদ দরজীর উপর গুলি লেগেছিল। গুরুতর
জখম। তাকে সাহায্য করতে গেলে সে কিন্তু থেকিয়ে উঠল,
“ভাইসব, যে-যার কামে যান, আমার দিগে নজর দেবেন না, খোদার
কসম। যে যার কামে যান।” কিন্তু তার রক্তশ্বেত দেখে হৃতিন
জন এগিয়ে গেল, খোদার কসম মানলে না। মজিদ দরজী তখন
চীৎকার দিয়ে উঠল, “নিজেদের কামে যান। আমিই পিছাইয়া
পড়লাম—” মুখের কথা জড়িয়ে আসে, তবু বেশ কষ্টে সে
অনুরোধ উচ্চারণ করলে, “বাঁচুন না। হে তো বুঝছেন। এক কাম
করেন।” সঙ্গীরা আদেশের অপেক্ষায়। “আমাকে ওই উচু ঢিবির
উপর গাছের গুঁড়ির লগে বসাইয়া ঢান, আমি লড়াই দেখবু।
দেখবু আমার ঢাশের মান্যে কেমন লড়ে। তয় মরণেও স্মৃত।”
প্রতিবেশীরা তার শেষ অনুরোধ রক্ষা করলে। চ্যাংড়োলা মজিদ
দরজীকে নিকটস্থ ঢিবির এক গাছের গুঁড়িতে স-চেস বসিয়ে দিলে।
মৃত্যুর পূর্বে অসম যুদ্ধে: ফলাফল সে শুনে গিয়েছিল। কারণ, তার
লোকান্তর ঘটে আরো চার ঘণ্টা পরে। খবর শুনে সে উদ্দেশ্যিত
বাড়ী যেতে চেয়েছিল পুত্রকন্তকে দেখার উদ্দেশ্যে। বাড়ী সে
গিয়েছিল বৈকি, কিন্তু প্রাণহানি।

গুলির পর একটা ছত্রভঙ্গ ভাব। দশ পনর মিনিট কাটে।
পানাবনে ঢেলা মারার পর পানাকুল প্রথমে হটে যায়, তারপর
আবার ফাঁকা জ্বালাগার দিকে মেন এগোয়, এখানে আক্রমণ-
প্রতিআক্রমণ তেমন রূপ নিলে। গুলি যাওয়ার পর অনেকে
ধরাশায়ী হয়। জখমীদের স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন
চলল। কিন্তু আবার দম্কা বাতাসের মত যারা অবশিষ্ট থাকে তারা
মরীয়া, প্রতি-আক্রমণে এগোয়। ঐ লাঠি-সেঁটা নিয়ে। লোহার

জ্বাব বাঁশ।

কিন্তু সিপাইগুলো বেশ একটা অসুবিধায় পড়ল। চারিদিক থেকে বেষ্টনী এগোনোর ফলে তাদের বিশ্বাস বদলাতে হয়। চারজন চারিদিক রক্ষা করে। ফলে এক এক দিকে চারজন। কিন্তু এমনভাবে অবস্থান নিলে আবার এগোনো চলে না, পশ্চাদপসরণের পথ বঙ্গ হয়ে যায়। আক্রমণে এই এক দিক সম্পর্কে সতর্কতা রণনৌতির পয়লা সবক, যা বেতনভূক সিপাইরা ভালমত জানে। ওদিকে কর্ণবিদারী ঝোগান নির্বাঙ্কব এই জগতে বৃথা যাচ্ছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। একটা মোটা বটগাছ আশ্রয় করে শেষে সিপাইরা অবস্থার কিছু উন্নতি সাধন করলে। মোটা গাছ, একদিক থেকে অস্তুত আক্রমণ বঙ্গ থাকবে। শুধানেও অসুবিধা। যদি মোটা গাছের 'সোজাসুজি' বিপরীত দিক থেকে কেউ আসে, তাকে আবার দেখা যাবে না। এই শক্ত মরীয়া। অস্ত্রশস্ত্র নেই। অর্থচ লড়তে এসেছে। আনাড়ীকে শিক্ষিতের যেমন ভয়, এখানেও তা-ই ঘটে। গুলির আঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাঢ়ছে। কিন্তু সেদিকে কাঠো জক্ষেপ নেই। সকলেই এখানে মজিদ দরজী। জীবনের শেষ সীমান্তেও মনোবল হারায় না। ওদিকে বেষ্টনী সংকীর্ণ হয়ে আসছে। লড়ায়ের আর একটা ফ্রন্ট বাড়ল। নিকটস্থ গাছপালায় অনেকে উঠে পড়ল, ঝুঁড়ির মধ্যে ইট-পাটকেল নিয়ে, তারপর ছুঁড়তে লাগল। যুদ্ধের সময় পঞ্চম ফ্রন্ট। ছু-একজন গুলির ঘায়ে গাছ থেকে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে তাক সব সময় এত প্রাণবাতী নয়। ইট-পাটকেলের বৃষ্টি হতে লাগল মাঝে মাঝে। এবার সিপাইরা প্রমাদ গলে। দশ হাজার লোকের বেষ্টনী ভেদ করে তাদের পশ্চাদপসরণের পথ বানাতে হবে। প্রমাদের বোধ হয় আরো কারণ ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় মুক্তিফৌজের সংঘর্ষে তারা দলচূট হয়ে গেছে। এই ধারণা অযুক্ত নয়। তারপর মার্চ করে করে এসেছে সারারাত। ফলে ধকল অনেক গেছে। সকালের খাওয়া, নেশ ঘূর—এসব ছাড়াই এই বেষ্টনীর মোকাবিলার

সম্মুখে পনর জন মাত্র আগী। ওদিকে গুলির-ভাণ্ডার তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে। আগেকার মত গুলি আর সিপাইরা খরচ করছে না। ওদিকে জনতাও অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, হয়রানি বাড়িয়ে তুলতে পারলেই এক সময় স্বেফ শ্বাসির চোটেই ওরা লড়ায়ে ইস্ফা দেবে। প্রোগানের তীব্রতা এবার আরো বাঢ়ছে। গাছের ডাল থেকে পর্যন্ত গায়েবী আওয়াজের মত শোনা যায়, “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীব জিন্দাবাদ, ইসলামাবাদ ধৰ্ম হোক” ইত্যাদি। এক একবার দুই দিকের স্তুতি মনে করিয়ে দেয়, না, কোথাও কিছু অশাস্তি নেই। পৃথিবী যেমন চলত তেমনি চলছে। দুই কুণ্ঠিগীর দাউয়ের খৌজে যেমন একে অপরের দিকে চেয়ে স্থাগু দাঁড়িয়ে থাকে টান-টান পেশী, সর্বাঙ্গের প্রতি মনোযোগ—এ-ও তার অভিলপ। সিপাইরা যে অমাদ গণেছিল, তা ধরা পড়ল, যখন দেখা গেল, তারা ঝুঁধু একদিকেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে বেঠনী খানিকটা ফাঁকা করল। তারপর সেই ফাঁক-পথে তারা দৌড়াতে লাগল। প্রাণপণ দৌড়। আর পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না তারা। গুলি ছোড়াও বন্ধ। এইভাবে তারা নিরাপদে কোথাও পৌঁছে যাবে, বোধ হয়, নিজেদের মধ্যে স্থির করেছিল। জনতাও তখন পিছ-ধাওয়া উল্লাসে ছুটতে থাকে। পেছনে পঞ্চাশ-ষাট জন মৃত আহতের সংখ্যা আরো ঢের বেশী। কিন্তু তখন এমন হিসাবে কারো মন ছিল না। জনতা সিপাইদের পেছনে ছুটতে লাগল লাঠি-উচু, মরীয়া এবং প্রতিশোধপরায়ণ সংকলনে অঠল। কেউ কেউ ধূয়ো দিতে লাগল, “ভাগছে, হালা পাঞ্জাবী ভাগছে।” “বাংলাদেশে লড়ায়ের সাথ একদম মিটাইয়া দিয়ু।” “ধর খান্কীর পৃত্তদের।”

পঞ্চনদের পঞ্চদশ অধিবাসীর তখন আর লড়ায়ে মন নেই। চরণই সকল হাতিয়ারের চরম। কোন দিকে তারা যাবে, এখনও আগে থেকে স্থির ছিল না। সোজা দৌড় মারছে, কোনদিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। জনতার মধ্যে তখন উৎসাহ আরো শত্রুণ বেড়েছে। গাছে উঠেছিল, তাদের কয়েকজন নামার কথা ভাবছে

না। সেখান থেকেই চীৎকার দিচ্ছে, “ওই যায় হালারা। পাকড়াও পাকড়াও। আমাদের বহু মারছে।” হ্র-এক জন গাছ থেকে সিপাইদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারছিল না। তারা ভাড়াভাড়ি নেমে জনতার সাথ ধরলে।

পনর জন পাঞ্জাবী সিপাই রাইফেল হাতে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই দৃশ্যে কয়েক ব্যক্তি এত উল্লিখিত যে হাততালি দিতে লেগে গেল। হয়ত ঘৃতদের মধ্যে তার ভাই থাকতে পারে, সেদিকে আর খেয়াল ছিল না। ধর—হালাদের ধর—এই রব পেছন থেকে হাজারে হাজারে একত্রুত ত্রাসের শৃষ্টি করবে—বিচ্ছি কী?

বোধ হয়, দম ফুরিয়ে এসেছিল অথবা দৈহিক এবং মানসিক ছই তাগদ নিঃশেষ, পনর জন জওয়ান শেষে সম্মুখস্থ এক মসজিদের ভেতর চুকে পড়ে জানালা দরজার খিল এঁটে দিলে। পুরু বেঠনী তখন ক্রমশ নিকটতর, মসজিদের চতুর্দিকে বাস্তুকীর মত গর্জমানঃ শালা কেওয়াড়ী খোলো। কাহা ভাগে গা এন্না খুন লে কর?

অভিজ্ঞতা থেকে প্রাণের অপচয় করে।

আলম বলে যায়, “হালাগো হাতে রাইফেল আছে। দরজা ভাইঙ্গতে গেলে যদি গুলি ছোড়ে, মাঝুম খামোকা মইবৰ। তার চেয়ে আগুন লাগানো দের সোজা।”

সেখানে সমস্ত উঠল, অগ্ন বাড়ী হলে স্বতন্ত্র কথা, এ তো মসজিদ। জনতা দ্বিধাবিত। কঁোচ, সড়কী, শাবল ইত্যাদি শানানো রয়েছে। কেবল লক্ষ্যস্থলের অভাব। মসজিদ এক অসুবিধায় ফেললে তাদের। কিন্তু সহস্র সহস্র মাথার মধ্যে আকেল কোথাও পাওয়া যাবে না—একথা অবিশ্বাস্য। যুবক কয়েকজন সলাপরামর্শের পর অপারেশনে মন দিলে।

“আমার সাক্ষাৎ মামতো বাই জহীর একড়া ফল্দী দিলে,” উচ্চারণ করলে আলম এবং সেই টানে সে বলে যায়, “হগ্গলে সেই মত কাম করতে লাগল।”

কাজ খুব সহজ। আবহমান বাংলা দেশ মাঝে মাঝে তা

প্রয়োগ করে এসেছে সাপের ক্ষেত্রে। সাপকে গর্তছাড়া করতে।

শাবল দিয়ে মসজিদের ছাদ কিছুটা ছিন্ন করে তারপর মুঠো মুঠো পোড়ালঙ্ঘা জনতার কয়েকজনে ভেতরে ফেলতে লাগল। এই ধৈঁয়ার প্রতিক্রিয়া সকলের জানা। বাইরে থেকে মসজিদের দরজায় শিকল তুলে দেওয়া হয়েছিল, যেন বাহাধনের। আর বেরতে না পারে।

ফল ফলতে শুরু করলে। একটানা কাশি। তারপর দরজা জানালায় মাথা কোটাকুটি। শেষে কাঙ্গা, চৌৎকার : “ভাইয়া বাঁচাও। মাঁই মুসলমান হুঁ।” আর কিছুক্ষণ পরে মসজিদের অভ্যন্তর শব্দ-শূন্য হয়ে গেল। বাইরে জনতাও এবার স্তুক। মারো বাকী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি।

জানালা ভেঙে পনরটা বেহেশ লাশ বের করা হলো। তরুণ জওয়ান সব ক'টি পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে বয়স। একজনের পকেটে মাকে লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেল। ডাকে দেওয়ার জন্য লিখেছিল আর ফেলা হয়নি। পত্রাদাতার নাম শের খান। ঝিলমের কোন গ্রামের অধিবাসী। চিঠি অবিশ্বিত মামুলী। তবে কয়েকটা খবর পাওয়া গেল। শের খান এক জায়গায় লিখেছে : “এখানে আসার আগে শুনিয়াছিলাম, বাঙালীরা মুসলমান নয়। তাহারা হিন্দুদের সহিত বসবাস করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছে। তাই পাকিস্তান চায় না। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি মসজিদ আছে। আজ্ঞান দেয়। লোকে নামাজ পড়ে। তাই বড় তাজ্জব লাগে। এখানেও দেহাতে লোক আমাদের মত বড় গরীব, চেহরা তন্তুরস্ত নয়। আমাদের পাহাড়ী এলাকায় লোক যেমন গর্তে থাকে, এখানে ঝুপড়িগুলো সেই রকম...”

বাকী পারিবারিক সংবাদ। ভাই-বোনদের খোজখবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলম শেষে বলে, “আমাগো পঁয়বটি জন মরছিল। আমারে নিয়া ছই শ' জন্ম। তাগোরে কবর দিলাম এক লগে। ওই

পনর জনেরও হৈই বন্দোবস্ত। মুসলমানের লাশ। মানুষে কইল
শরাশরীয়ৎ মোতাবেক দফন হওন উচিত। ওদের জানাজা
পড়লেন ঐ মসজিদের ইমাম সাব। তিনি কইলেন—হাদিসে আছে
আপন দেশকে ভালবাসাই ইমান।”

কথাটা গুছিয়ে বলতে পারেনি আলম। হাদিসে আছে,
“হাবুল ওয়াতান মিনাল ইমান।” অর্থাৎ দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

তারপর আলম বললে, “ইমাম সাব কইলেন, ঠিগ্ করছেন,
হালাদের সবক দিছেন। তবে জানাজা ফরজ। (অবশ্য পালনীয়
শাস্ত্রীয় ক্রিয়াচার)।”

নেপথ্যে একজন বলে উঠল, “সাব, আপনাগো নাও আইয়া
পড়ছে।”

গাজী রহমান আলমের দিকে তাকিয়ে আরো ত্রিয়ম্বণ হয়ে
যায়। সেও তো দেশকে ভালবাসে। তার এই মানসিক জোর নেই
কেন? বয়স, ভদ্রলোক হওয়ার ফল, প্রাণভয়? না, আর কিছু!

গাজী রহমান জবাব পায় না। তার প্রয়োজন ছিল
নৌকার।

নিষ্ঠুরতা কর্তৃর মর্মস্থাতী হতে পারে ?

প্রেমিক-প্রেমিকা গৃহবন্ধনের প্রশ্নে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্তৰ মুখে-মুখি বসে থাকে । তখন বেদনা তো এক-তরফা । অতীতের সম্পর্ক হয়ত কিছু অসোয়াস্তি স্ফটি করতে পারে প্রত্যাখ্যানকারীর মনে, তার প্রসার সংকীর্ণ, অপর জনের দৃঢ়ব্যথার মত নয় ।

কিন্তু যখন শত শত, লাখ লাখ মানুষ একই বেদনার ভাবে মুহামান এবং যীশু আঞ্চের মত যে-যার যত্নণার ত্রুশ কাঁধে এগোয় একদম চুপচাপ, সেই নিষ্ঠুরতার স্বরূপ কী পরিমাপ করা যায় ? এই জন-ধারা বাইরে থমথমে সমুদ্রের মত, উপরে আলোড়ন-মুক্ত, এই পদচারণা কল্পনালীন । কিন্তু তার চেয়ে মর্মস্থাতী স্তৰতা আর কিছু নেই পৃথিবীতে ।

ঢাকা শহর সঙ্ক্ষার আগেই মরে যেত । আততায়ীর লক্ষ্য-আকর্ষণের আশক্তায় নগরবাসীরা বাতি জালত না । অঙ্ককার প্রেতাভ্যাস জননী, স্তৰতা প্রেতাভ্যাস সহচরী । গোটা নগর তাদের আপ্যায়নে একদম চুপ করে যেত । ঘরে মানুষ আছে । কথা বিবল উচ্চারিত, তবু আছে । নৈঃশব্দের এমন মোড়ক তত ভৌতিপ্রদ নয় । কিন্তু যখন জনতা বাক্হীনতার মাছুর বিহিয়ে যায়, তখন পূর্বাশক্তার চেয়ে স্তুতুড়ে-গঙ্কী আনন্দওয়া কেবল ডয়াবহ মনে হয় না, বরং হৃৎপিণ্ডে টান পড়ে সজ্জোর হেঁচকায় ।

শহরতলীর পাশে এক বাঁশের ঘরে কয়েকদিন কাটিয়েছিল গাজী রহমান । ধানবাহন না থাকলে বা অভাব ঘটলে, ঢাকা শহর ছেড়ে যাওয়ার এই পথ অতি উত্তম এবং নিরাপদ । ছ'মাইল হাঁটলেই তুমি বরকন্দাজদের আওতামুক্ত । দিনে তখন কোথাও-

বেক্ষণ না সে। কিন্তু তার জ্ঞানালাপথে দেখা যেত, হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা কাতারে কাতারে নিঃশব্দে এগোচ্ছে, চিরাচরিত বাঙালীমূলভ হৈচে-মুক্ত। মানসিক-ভাবে তাদের সামিল গাজী রহমান। অসহ্য লাগত তার কাছে এই নৈঃশব্দের বহর। আনন্দনা কখন জ্ঞানালা বক্ষ করে দিত সে জ্ঞানত না। তবু রেহাই ছিল কী? একা একা বাঁশের ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করত নিরূপায় আঞ্চলিকরণ্য।

স্তৰকার অঙ্গকৃত আঘাত এমন কঠিন হতে পারে সে পূর্বে উপলক্ষি করেনি। অর্থচ হামেহাল মানে-অভিমানে, ক্ষেত্রে, আস্পদ্ধৰ্মের প্রতি স্থূলায় আকস্মিক চুপ হওয়া কত স্বাভাবিক। পরিধি, প্রসার তার রূপ বদলে দেয়। লাখ লাখ লোক পলাতক। এই সাদৃশ্য কিন্তু স্তৰকার জনক হতে অক্ষম। পার্শ্বীর ঝাঁক বাকুদের গন্ধ বা অগ্ন কোন আশঙ্কায় উড়াল দেয়। তাদের চীৎকারই ভূমিকা, অপরের প্রতি সতর্কতার নোটীশ। সব ক্ষেত্রেই এমন ধারা প্রবাহিত। এখানে প্রাণশক্তি আসল হিসেব নয়। দাঙ্গিকের জুতাপেটা খেয়ে সহায়হীন ব্যক্তির স্তৰকা কতকটা এই নির্বাকতার কাছাকাছি যায়। কিন্তু শ্রোত যেমন তরঙ্গে পরিণত হয় বাতাসের চাপে, এই ক্ষেত্রে অপমান-জর্জর জ্ঞালা তেমনই পেষণের কাঁরিগর। সকলেই ইচ্ছ হারিয়ে একে অপরের কাছে ছোট হয়ে গেছে। এই চেনা আর কাউকে মুখ খুলতে দেয় না। অপমানিত তার পিঠের ছড়া-দাগ আবৃত রাখে পর-চক্ষু থেকে। তাই তো সকলে নিজের আবরণে আবৃত। কেউ কখন বলতে পারছে না।

গোটা বাংলাদেশ স্তৰ। শব্দের মালিক তারাই যাদের হাতে মেশিনগান প্রভৃতি আঘেয়ে অস্ত্র আছে, পিতলের নক্ষত্র উর্দির উপর বসিয়ে যারা নিজেদের ভাবে পৃথিবী এবং আকাশ-বিজেতা।

চাকা শহীরের সেই সব দিনরাত্রির স্থৱি গাজী রহমানকে পীড়িত করছিল। এখানে নৌকায় সকলে চুপচাপ। তুই সঙ্গী পাটাতনে

একপাশে শুভ্রসূরি সূম দিছে অতি শৃঙ্খলা-নিবাদ সহ। ক্লান্তি তাদের রেহাই দেয়নি। সৈয়দ আলি বেশ বিমিয়ে পড়েছিল। সে হাই তুললে তিন-চারবার। অঙ্গ হ'জনের সঙ্গ ধরতে চায় —বোধ হয়। কিন্তু গাজী রহমান ঠঁটো বসে রইল। সাবেক নিষ্ঠকতার স্মৃতিচিত্ত তার চোখে লেগেই থাকে এক-নাগাড়।

এই বিল খুব ছোট নয়। পাশে তিন মাইল হবে। অবিশ্বিত শব্দের জগৎ এখানে সীমিত এবং অনুচ্ছ। দাঢ় ফেলার শব্দ, হঠাৎ-হঠাৎ পাখির ডাক—তা-ও বাজখাই কোন গলা নয়, খুব জোর চিল। সেদিক থেকে স্কুবতা এখানেও প্রমাণিত। গাজী রহমান তাই স্কুবত সোয়ান্তি পায় না। অনড় বসা থেকে মাঝে মাঝে সে পাশ বদলায়। একবার কম্ব'য়ের উপর হাত রেখে সেও শোয়ার চেষ্টা পেলে, কিন্তু তখনই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বিছানায় কাটা ধাকার প্রয়োজন নেই, মন যদি নির্বিবাদ না হয়। বিলের কাকচোখা জল সেও আঁজলা ভরে হাত-মুখ ধোয়ার পর পান করলে। একবার আকাশ দেখে নিলে, উর্বরমুখ। সূর্যের তাপে তেমন কামড় নেই। বেলা চলে গেছে। সে-ও এক অসোয়ান্তি। বর্জার গ্লোকায় কারফিউ জারী আছে। সময়-মত পৌছতে না পারলে ফ্যাসাদ বেধে গেলেই হলো। সৈয়দ আলির আশ্বাস অবিশ্বিত সেদিক থেকে সহায়। পূর্বাশঙ্কা গাজী রহমানের নিকট আর মোটেই বিপুল আকারে হাজির হয় না।

বহু দূর জুড়ে বিলের উপর কলমৌ লতার শয়ান মূর্তির উপর কতগুলো লাল ফড়িং লেজের হাওয়া দিতে বেশ ব্যস্ত। গাজী রহমান তা দেখেও দেখলে না। নির বিস্তার আকাশ-তটে কোথাও বিবাগী। এই লম্বা দৌড় আনমনা হওয়ার জন্যে সুবিধা-জনক। প্রোট শিক্ষকের দৃষ্টি কিন্তু অস্ত্রিব। একবার হিতি পেলে ঘুম্ত হই সঙ্গীর মুখের উপর। তাদের বক্ষস্পন্দন দেখা যায় শৃঙ্খলানিঃশাসের তালে তালে সমতা বজায় রেখেছে। অমন ঘুম এলে মন্দ হতো না। কিন্তু বিনিষ্ঠতা যার কাছে ধর্ম হয়ে দাঢ়িয়েছে,

তার ইচ্ছাপত্তি নিশ্চয় কম-জোর। নিজের এই দুর্বলতার মূখ্য-
সুধি হতে গিয়ে গাজী রহমান রাস্তা বদল করলে। বলদের শিং
পাকাড়নেওয়ালার শরীরের মধ্যেও কয়েকটা বলদ থাকে। সে
সত্যিই কম-জোর মানসিক তাগদের ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবনে অনেক
প্রলোভন তা হলে কী করে সে এড়িয়ে এসেছে? সেখানে বিপদ
অত প্রত্যক্ষ নয়। আগের টানাটানি ছিল না। গাজী রহমানের
কাছে আস্তসমীক্ষা আজ ভয়াবহ। ওই পথ মাড়ানোর চেয়ে বরং
অসোয়াস্তির অকারণ সমতলে ঘোরাফেরা চের আরামপ্রদ। সৈয়দ
আলি একবার কি যেন বলতে গিয়ে খেমে গেল। গাজী রহমান
শুচিয়ে প্রশ্ন বের করতে পারত। হ্যাঁ দিকে অনিচ্ছা এখানে কিন্তু
এক ধরনের নয়। সৈয়দ আলি নিজেকে যত চেকে রাখতে পারে
ততই তার আনন্দ। অভিজ্ঞ শিক্ষক তখন দুরত্ব বজায়ে মশগুল।
বিবে বিষক্ষয়। স্তুতির পরিধি আরো বাড়ুক, সব ফুৎকারে উড়ে
যাবে। এখানেও শ্রেণীভাগ আছে। সব নৈঃশব্দের উৎস তো
এক নয়।

বিলের জল জায়গায় জায়গায় খুব কম। একবার নাওয়ের
তলা দৃশ্য শব্দে ঠেকে গেল। হঠাৎ তাল-ফেরত। ঘূমস্ত দু'জন
পর্যন্ত ঝাঁকুনি খেলে। গাজী এবং সৈয়দ আলি নৌকার কিনারা
জাপটে তাল সামলায়। এবার নৌকা সরগরম হওয়ার কথা।
কিন্তু সঙ্গীরা আবার যথাস্থানে ফিরে গেল। ওদের চোখ থেকে
ঘূম যায়নি। এই সব ছোটখাট দুর্দোগ অনেক সময় স্বাভাবিকতার
মুখবন্ধ হতে পারে। কিন্তু এখানে কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

দাঢ়ী মাথি দুজনেই বোবা, নিজ কর্তব্যে মোতায়েন। দূরে
তীরস্থ গাছপালা অস্তিত্ব জমাট রঙে পরিণত করেছে। আশপাশের
চিবি পর্যন্ত ঘূলিয়ে গেছে তার সঙ্গে।

একটা আওড় ফিরল নৌকা। সৈয়দ আলি তখন গাজী রহমানের
কানের খুব কাছাকাছি মুখ এগিয়ে ফিসফিস শব্দে ডাক দিলে,
“স্তার—!”

হয়ত ভেতরের জ্বর অব্যাহত আছে। তাই গাজী রহমান কোন জ্বাব দিলে না, সৈয়দ আলির মুখের উপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাখলে। ফিসফিস শব্দের ভেতর আবার কথা ভেসে উঠল, “স্নার, আমরা বর্ডারের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। নৌকায় খুব জ্বার আর তিন মাইল।”

আচমকা ধাক্কা থেলে গাজী রহমান। কথাগুলো তাকে অস্তির করে তুললে। এতক্ষণ স্তুকতার সম্মতে যন্ত্রণায় বুঁদ, তার কিন্তু চাঞ্চল্য ছিল না।

“তিন মাইল!” গাজী রহমানের বুকের মধ্যে কথাগুলো সেঁথিয়ে রইল। কিন্তু অস্ত্রিভার আকর্ষণে সে তখনই নৌকা থেকে ঝাঁপ দিলে বিচ্ছি কিছু ঘটত না।

নৌকার এক কিনারা আবার বাসের শিকের মত চেপে ধরে নিজের অভ্যন্তরে পরিআজক গাজী রহমান। বাইরে তার কোন চিহ্নই পৌছায় না। কেউ দেখে না বিস্তুর শিক্ষকের সম্মুখে কী অতিমূর্তি ভেসে ভেসে উঠছিল!

মাঝি চালাও, জ্বারে চালাও, আরো জ্বারে জ্বারে চালাও। তোমার নৌকা হাঁটে না কেন?...এ কোথায় আনলে?...এমন সুড়ং। অঙ্ককার। তারই ভেতর কোথায় যাবে? জ্বারে চালাও। জ্বারে—আরো জ্বারে। দেখছ না চারিদিকে মোজখ। অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ জলছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য নুরনারীশিশু দলে দলে এবং ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে আর-এক কুণ্ডের মধ্যে। এরা কেউ কিন্তু কোন পাপ করেনি। গ্রামের সাধারণ মানুষ। কুঁড়েবরে বাস। বাঁশবনের অঙ্ককারে পেঁচার সঙ্গে মৈত্রী পাতিয়ে অনেকে জীবন খোয়ার করে দিয়েছে। কেউ পাপী নয়। কারো পাকা ধানে মই দেয়নি একজনও। বরং শব্দের ঘটিবাটি গুরু নিলামের পরে জরুর দিকে চোখ পড়ত এবং সেও একদিন

କୋକ ହେବେ ସେତ—ଅନ୍ଧାର ମାଲେର ଆର ଏକ କିମି ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ପାପୀ । ପାପେର ସଂଜ୍ଞା କେ ଦେବେ ? ଆମାର ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ ହଲେଇ ତୁମି ଅସଂ ଆର ଅସଂ ଅର୍ଥ ପାପେର ଦୋସର । ଓରା କାହାରେ ମର୍ଜିର ଉପର ନିଶ୍ଚଯ ଲାଧି ମେରେହେ । ତାଇ ପାପମୁଣ୍ଡି । ପୂର୍ବେ ପାପ କରତ ଭଗବାନେର ବିକଳ୍ପ । ଏଥିନ ତାର ଜ୍ଞାନଗାୟ ମାନୁଷ ବସିଯେ ଦାଉ, ଜ୍ବାବ ପେଯେ ସାବେ । ତାଇ ଅଗ୍ନିବୋମାଯ ପାପେର ଶାସ୍ତି ହୟ ଏଥିନ । ଶ୍ରାପାମେ ଗାୟେର ଚାମଡ଼ା ଛଡ଼େ-ଛଡ଼େ ଥିସେ ଥାଯ । ଭଗବାନେର ନରକେର ଶାସ୍ତି ତଡ଼ିବଢ଼ି ହତୋ । ଏଥାନେ ତିଲେ ତିଲେ ଦଗ୍ଦଗିର ଉମୁନ ଧୁଇୟେ ଧୁଇୟେ ତୋମାର ମେଦ ମାଂସ ଆର କାକ-ଚିଲେରଙ୍ଗ ଆହାରଯୌଗ୍ୟ ରାଖବେ ନା । ହାଲ ସୁଗେର ମାଦାରୀରା ଏହି ଆଜବ ଖେଲାର ଆବିଷ୍କାରକ । ତାଇ ପୂର୍ବେ ତୁମି ପାପ ବା ଅନ୍ତାୟ କରତେ ଏକ ଏଲାକାୟ, ଏକ ଏଲାକାର ମାନୁଷ ବା ମାନୁଷଗୋଟୀର ବିକଳ୍ପ । ଏଥିନ ତୋମାର ପାପ ବିଶମୟ, ଆର ଆଗେକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାଯ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ । ତୋମାର ପାପେର ଶାସ୍ତି ଦିତେ ଆସବେ ଗୋଟା ପୃଥିବୀ ନା ହୋକ, ଅଞ୍ଚ ଦେଶ, ଅଞ୍ଚ ଜାତି । କାରଣ ତୁମି ଦାଡ଼ିଯେହ ତାଦେର ଇଚ୍ଛାର ବିକଳ୍ପ—ସଥିନ ତାରା ଦୁଇନ ଆବାର ସାଙ୍ଗାଏ । ତୁମି ଆର ଗୋଟି-ଜୀବ ନନ୍ଦ, ତୁମି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ । ମାନୁଷ ହିସେବେ ତୋମାର ଉପରି । ତାଇ ତୋମାର ବିନାଟିର ପଥ କତ ସହଜ, କତ ସୁଗମ । ତୋମାର ଅଭ୍ୟାଚାରୀ ରାଜୀ ନା ଏହି ଶତେ ତୋମାର ମଙ୍ଗେ, ନିଃଶ୍ଵର ନିର୍ଭାବନାୟ ବଗଲ ବାଜିଯୋ ନା । ତାଦେର ଶାଙ୍ଗାଏର ଠିକ ତୋମାର ବୁକ-ବରାବର ମେଶିନ୍‌ଗାନ ଛୋଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ମହଡା ନିଯେ ଆଗେ ଥେକେ ବସେ ଆଛେ । ତୁମି ସର୍ବହାରା ହଲେଓ ତୋମାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଯେନ ଅଞ୍ଚ ସର୍ବହାରାଦେର ରାଷ୍ଟ୍ରେ ଦିକେ ନା ଥାଯ । ସେ ତୋ ହିସାବ କରଛେ ଆଭ୍ୟାର୍ଥେର । ସୁବିଧା ହଲେ ପାଶେ ଆଛେ, ଅନ୍ତଥାଯ ନେଇ । ତୋମାର ରାଜୀ ତୋ ସର୍ବହାରା ନଯ । ଦେଖବେ, ଶ୍ଵାର୍ଥ ଥାକଲେ ତୋମାର ରାଜୀ ତାର ଇଯାର, ତୁମି ଜୁତା-ବାହକ, ଯା ଦିଯେ ତୁମି ନିକି ପେଟା ହେ । ତୋମାର ଲାଲ ଝାଙ୍ଗାର ସାମନେ ସେ ତୋ ତେଜେମାର ସୀତ । ତେଜେ ଆସବେ । ଖାଡ଼ା-ଶିଂ । ହେଁକେ ଉଠିବେ ପୁରୁଷୁ ସୀତ, “ଆମାର ଲାଲ ରଙ୍ଗଇ ଆସଲ, ତୋମାରଟା ନକଲ ।” ଶ୍ରାୟ, ଅନ୍ତାୟ ? ଜୋରେ

—জোরে—চালাও, মাৰি। এই নৱক থেকে আমি বাইৱে যেতে চাই। কোথায় এলাম এই সুড়ঙ্গের ভেতৰ ? কোথায় ? আমি আৱ নিঃখাস নিতে পাৱছি না। তোমাৰ বৈঠা জোৱসে হাঁকাও। এ কোথায় নিয়ে এলে...? ? ?

ধৰ্মবাদ মাৰি, সুড়ঙ্গের ভেতৰ থেকে তুমি বেৱিয়ে এসেছ। কিন্তু এই জায়গাও তো প্ৰশংস্ত তেমন কিছু নয়। বিলেৱ উদারতাৰ মধ্যে তবু অশাস্ত্ৰ প্ৰাণ চোখ মাৰফত দূৰে দূৰে ছড়িয়ে পড়তে পাৱত। এ জায়গা সুড়ং না হলেও তাৱ চেয়ে আৱ কত বড়ো ? কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নৱকে এমন চিজ দৃঢ়প্ৰাপ্য। একি চাৱিদিকে নানা ধৱনেৱ দোকানপাট ! ছোট জায়গা, হঠাং প্ৰসাৱ-তাৱ নিৰ্দেশ তবু বজায় রাখে। তৱতৰ স্বচ্ছ পানি বইছে ক্যানালেৱ উপৰ। তোমাৰ নৌকা তো আৱ নৌকা নেই। গণ্ডোলা। ভেনিস শহৱেৱ ভেতৰ দিয়ে কৌ আহৰা আজ্ঞাৱ কোন সফৱে বেৱিয়েছি ? এখানে নিঃখাস নেওয়া যায়। কিন্তু দয় মিতে গেলে, মনে হয়, নৱক নিকটেই কোথাও আছে। আহ, জোৱে চালাও, জোৱে। স্বৰ্গ হোক, নৱক হোক আমাৰ কিছু আসে যায় না। গতিৰ হাতে নিজেকে সোপৰ্দি কৱেই আমি নিজেকে বাঁচাতে পাৱি। আমাৰ বুকেৱ তোলপাড়া নেতো কই তাড়াহড়া ছাড়লে। যুগ-যুগান্তে মুকুল ফোটাতে আমাৰ খোড়াই কেয়াৱ। জোৱে—আহ, আৱো জোৱে। মাৰি তাগদ কিছু ব্যয় কৱো। কিন্তু ভেনিস-সুন্দৱীৱা কোথায় গায়েব ? ক্যানেলেৱ পাৱে হেমকান্তি এবং লালেৱ আভায় ঝলমল ওটা কিসেৱ দোকান ? ভেনিস সুন্দৱীৱা নেই। তাদেৱ দেহকাও ঝুলছে দোহুল-ছুল। পাশে কৌ বড়শী-বক্র আংটায় গাঁথা ? একটা ঠ্যাং তলপেঁটেৱ নীচ থেকে কাটা। একটা কচি ঝুঁ শিকেৱ মাথায় শোভা পাচ্ছে। যন্ত্ৰিজ্ঞানেৱ যুগেৱ কোন ভাৰ্সৰ্ব ? গণ্ডোলা থামাও মাৰি, একবাৱ দেখে নিতে। একেবাৱে থামিও না। গতি ছাড়া আমি যৃত। নৰ নৰ উত্তাদনা আবিষ্কাৱে অসমৰ্থ মন যন্ত্ৰে উপৰ তাৱ' বাল ঝাড়ে। তাই গতি...অগতিৰ

গতি...। গণ্ডোলা থামিও না। আমি লাকিয়ে নেমে যাব, আমার দেহও একটু গতি-সমস্তি হোক। তুমি গণ্ডোলা চালিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। আমি দোড় দিয়ে তোমার নাগাল ধর্ব এবং আবার লাক দিয়ে ঠিক উঠে পড়ব। ওটা ভাস্কর্য না কসাইয়ের দোকান, খোজ নিতে হয়। নচে কৌতুহল না-মেটার অপরিচ্ছিপ্তি আমাকে আরো হঞ্চে করে তুলবে!...এগোই, এগোও.....

তোমার গণ্ডোলায় এমন উদ্ঘাদের মত ছুটে এসে লাকিয়ে উঠলাম। এত ইঁপাছি দেখে বেশী অবাক হয়ো না। একটু দম নিই। আমার মুখেই শুনতে পাবে।...

...আজব বিপণি। শুধু নয়নারী, শিক্ষা, কিশোরদের দেহ-টুকরো বুলছে আংটা থেকে। গোটা কোথাও কিছু নেই। উক, স্তন, দেহকাণ—এমন নিছক অংশ পর্যন্ত আছে। কসাইগুলো কাটছে আর বুলিয়ে রাখছে। রক্তের এতটুকু অপচয় নেই। সব শিশিভর্তি গুদামজাত হচ্ছে। যতক্ষণ দর্শক ছিলাম, ওরা আমার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে তাকায়নি। কিন্তু যেই জিজ্ঞেস শুক্র করলাম, ওরা আমাকে ধিরে ধরলে, কৌতুহল আমার কাল হলো। “কী হচ্ছে, এত জানতে চাও কেন?” একজন জিজ্ঞেস করে বসল, শাপিত হোরা তার হাতেই বর্তমান।

—খরিদ্বার জিজ্ঞেস করবে বৈকি।

তারা অবাক হয়ে অবাব দিলে, “খরিদ্বার কোথায় দেখলে?”

“এটা দোকান না?” আমার প্রশ্ন।

—আমরা কিছু বেচি না।

—দোকান কী না?

—না, দোকান নয়।

—তবে এই বাজারে?

—ভাস্কর্য। অপরে দেখবে বলে।

—ভাস্কর্য?

—হ্যাঁ, জ্যান্ত মাংস লাশ বানিয়ে ভাস্কর্য। আমাদের ভাস্কর্য

ଆବାର ରଣବିଶ୍ଵାରଦ ସେନାପତି ।

“ବେଶ । କିନ୍ତୁ ତୋମାଦେର ଧରିଦ୍ଵାର ନେଇ କେନ ?” ସେଇମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛି ତାରା ଆମାକେ ସାତ-ଆଟଙ୍ଗନେ ଘରେ ଧରଲେ । ଅତ୍ୟେକେର ହାତେ କ୍ଷାଇଯେର ପେଶାଯ ଯା-ଯା ଚିଜ୍ ଲାଗେ ତାର ସରଙ୍ଗାମ ସହ ।

—ଏଣ୍ଠଳୋ କୀ ହବେ ?

—ତୋମାକେ କ୍ଷାଇ ହତେ ହବେ ।

—ଆମି କ୍ଷାଇ ହତେ ଯାବ କେନ ?

—ଯାବେ ।

—ମାନେ—?

—ହବେ । ହତେ ହବେ ।

—ଜୋରଜବରଦଷ୍ଟି ?

—ତା-ଇ ।

—ସଦି ନା ହଇ ?

—ହବେ । ଆଲବନ୍ ହବେ ।

—ନା, ଆମି କ୍ଷାଇ ହତେ ପାରବ ନା ।

କଥାଣ୍ଠଳୋ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ର ଏକଙ୍ଗ ଧିଷ୍ଟିଯୋଗେ ବଲଲେ, “ନିଧା ଆଙ୍ଗୁଲେ ସି ଓଠେ ନା । ଏଠି ଆଞ୍ଚ ଖାନ୍କୀର ପୁଣ୍ଡ । ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଲେ । କୌତୁଳସୁତ୍ର ଟିନଟିନେ । ଜଜଦି ଲାଓ ।”...

ଦୋକାନେର ଏକକୋଣାଯ ଡାଣୁ, ବେଡ଼ି, ଆରୋ ନିର୍ଧାରନ-ସତ୍ତ୍ଵ ଯଥା ପାଂଚ ଥ' ପାଓୟାରେ ବାଲ୍ବ ଦେଖେ ଆମି କ୍ଷୟ ପେଯେ ଯାଇ, ଏବଂ ବଲଲାମ, “ଏ ସବ କୀ ?”

“ଶୋନୋ, ଆମାଦେର ଏଥାନେ ଧରିଦ୍ଵାର ଧାକେ ନା । ଏଥାନେ ହୟ ତୁମି କ୍ଷାଇ ଅଥବା ତୁମି ମାଂସ । ମାରାମାରି ରାଙ୍ଗା ବନ୍ଧ ।” ଏକଙ୍ଗନେର ମୁଖେ ଏହି କଥା ଶୋନାମାତ୍ର ଆମି ବଲତେ ପାରବ ନା କୀ ଭାବେ ଧକ୍କାଧକ୍କି ଶୁଣୁ -କରେ ବେରିଯେ ଆସତେ ପେରେଛିଲାମ । ତାରପର ପ୍ରାଣପଣ ଦୌଡ଼େଛି ଶୁଣୁ..... । ହୟ ତୁମି ମାଂସ ଅଥବା କ୍ଷାଇ..... ମାରପଥ ଏଥାନେ ବନ୍ଧ..... ।

হাত চালাও, মাঝি, দেরী করো না, ওরা পিছু ধায়, যদি এসে
পড়ে ! জোরে বৈঠা মারো, আমি আর পারছি না……তমসো মা
ঝ্যোতির্গময়, অসতো মা সদগময়……

মৈয়দ আলি ঘূমন্ত দুই সঙ্গীর অমুপদৌ ।

নির্জন বিল ।

অন্তহীন স্তুতার ছেদ ঘটছিল শুধু দাঢ় ফেলার বপাবপ
শব্দে ।

“মানব-অধূষিত এলাকা নয়।”

আন্তর্জাতিক সীমারেখায় হই দেশের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা, ফেলে রাখা হয়, সেখানে কোন মাঝুষের বসবাস থাকে না, থাকতে দেওয়া হয় না। তার মধ্যে গেলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে, তুমি আর মহুষ্য পদবাচ্য নেই, অর্থাৎ অস্ত। স্মৃতরাঃ হই সীমান্ত থেকে তোমার হত্যা-আয়োজন মোতায়েন থাকে। অবিশ্ব বেঁচে যেতে পারো। তার কারণ বিভিন্ন।

গাজী রহমান এবং সৈয়দ আলি এমনই সীমান্তার ভেতর ঢাকিয়ে ছিল।

সঙ্গী হজন নিজেদের সিদ্ধান্তে ক্রত পা চালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গেছেন। ওদের হ'জনের পেছনে পড়ে থাকার কারণ ছিল। গাজী রহমানের দোমনা-ভাব। নিজের নিরাপত্তার প্রশংস আছে। তার চেয়ে বড় প্রশংস দেশের মাঝুষের সঙ্গে ঘোগাযোগ। তা হারিয়ে গেলে তার প্রয়োজন তো শেষ হয়ে যায়। শুধু বাঁচাই বড় কথা নয়।

রৌকা ছেড়ে দিয়েছিল সৈয়দ আলি। গাজী রহমানের বুকতে বাকী থাকে না, সঙ্গী এক বিশদ ছেলে। এইসব কাজে অচুর অভিজ্ঞতা এবং রাস্তা জানা আছে।

হই জনে কথাবার্তায় আর বাখ-চাক কিছু নেই। আশ্রয়ের জন্য সব বন্দোবস্ত আছে। নাম, ঠিকানা মুখ্য করে নিয়েছে গাজী রহমান। হই দিকে প্রয়োজন-মত সে যাতায়াত করতে সমর্থ।

কিন্তু সমস্তা বর্তমানের। সে এখন কোন দিকে থাকবে?

সময়ের প্রশংস ঠিক এই ছিদ্রাষ্ট্রের সময় বড় হয়ে দেখা দিল।

গাজী দশ-পনর মিনিটের বেশী অপেক্ষা করতে পারবে না।

বিপজ্জনক এলাকায় সর্তর্কতার প্রশ্ন আছে। শ্রষ্ট-নার্ভ গাজীর দ্বিধা কিন্তু ঠেলে ফেলে দিলে। কৃশ চেহারায় সৈয়দের অমন ব্যক্তিক লুকিয়ে ছিল, গাজী রহমান অবাক হয়।

—স্তার—।

—কী বলো।

—আপনার যা শরীরের অবস্থা রেঙ্গা সাহেবের মুখে শনেছি, আপনি আজ সোজা বর্জার পেরিয়ে ওদিংকে যান। দেরী করবেন না।

—কিন্তু—।

—যোগাযোগের পথ তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। এখন সাময়িক' বন্দোবস্ত। শর্ট টার্ম প্ল্যান।

সৈয়দ আলির কথাবার্তা মার্জিত মনের প্রতিষ্ঠিনি মনে হয় প্রবীণ শিক্ষকের কাছে। অথচ চেহারায় তার প্রকাশ নেই। বিশ্বিত হয় গাজী।

—আচ্ছা...।

—স্তার, দ্বিধা রাখবেন না। অবিশ্বিত এদিকেও আপনার বন্দোবস্ত রইল। কিন্তু শরীর কিছু নয়, তা আর বলতে পারেন না। তাই আমি অহুরোধ করব, আপনি সোজা চলে যান। এই তিন শ' গজ—যদি আপনি বলেন, আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

—তা আর দরকার হবে না।

—আমার হাতে আর সময় নেই।

গাজী রহমান চতুর্দিকে তাকায়। ভোরের আলো সবেমাত্র পূর্বের আকাশে জানান দিচ্ছে। রাত্রে এক চাষীর বাড়িতে ছিল তারা। রাত থাকতে থাকতে বেরুতে হয়। এই সময় নাকি এদিকে নিষিদ্ধ পারাপারের জগ্ন তোকা। আশপাশের চাষীরাই হাওয়া বলে দেয়। গুণগোল থাকলে তারাই নিষেধ করে, এখন ওদিকে যাবেন না।

গাজী রহমানের জীবনের প্রথম উপলক্ষি—আজীয়তার এত যোগ-সূত্র এদেশের পথের দিকে ছড়িয়ে থাকে! চোরডাকাত সংখ্যায় ক'জন? অকৃতির মধ্যে বিকৃতি অল্পসম্ভ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ভোরের আবছা অঙ্ককারে পথ-ইটার সময়, অতিপ্রত্যুষে জাগর এক কৃষক সোজামুজি বললে, “ঠিগ সময় বারাইছেন, মিয়াসাব।”

এই পথে ইটার উদ্দেশ্য তাদের জানা থাকে নাকি?

এই জায়গায় টিলার বহর বেশ কয়েক মাইল ছড়িয়ে রয়েছে। একদম সমতলভূমি নয়। এই বন্ধুরতা গাছপালার অবস্থান মনেহর করে তোলে। চোখ সহজে ক্লাস্ট হয় না। এমন কী ঝোপঝাড়ের বিশ্বাস অস্তুত ঠেকে। টিলার মধ্যখান থেকে হয়ত সরু রাঙ্গা রয়েছে। ইটার সময় নৌচে যেমন ঝোপের বিস্তার, উপরেও তেমনি। সমতলভূমির ঝোপঝাড়, যত ঘনই হোক, অরণ্যের আভাস দিতে অক্ষম। আজ অজানিতেই গাজী রহমানের এদিকে চোখ ধার। নিজেই সে অনুভব করে, শুধু ঈর্ষ জায়গা-পরিবর্তন তার দেহের উপর স্বাস্থ্যপ্রদ নিঃশ্বাস ফেলতে তৎপর।

আর একটু পরে শূর্য উঠবে। তার বিলিক ঐ বনানী-শীর্ষে। নৌচে অঙ্ককার এখনও সরে যায়নি। এই আলো-অঁধারির সময়ে এলাকার সৌন্দর্য মুহূর্তে প্রত্যন্বর্ধিত। চোখ কি তার দৃষ্টি কিরে পাচ্ছে? আজুজিজ্ঞাসার পর ছই চোখে হাত বুলায় গাজী রহমান। সকালের বাতাসে শীতল করতাল মমতার মত বিগলিত। আঙুলের অস্তিত্ব শুন্ছে গেছে, সে জানে না।

“স্তার”, সৈয়দ আলির ডাকে চমক খায় গাজী রহমান। সে আরো যোগ করলে, “সামনের টিলা লক্ষ্য রাখবেন। তার পরবর্তী টিলা এখান থেকে দেখা যায় না। এই আড়াল পেকলেই চোখে পড়বে। সেই টিলায় পৌছানো মাত্র বুঝবেন আপনি বর্জাৰ পার। আর একদম নিরাপদ। অবিশ্বিত এই জায়গাও নিরাপদ। তবে অত নয়।”

গাজী রহমান পথ-নির্দেশ এই বিভীষণবার শুনলে। সৈয়দ আলি অধৈর্য হয়ে উঠছে, স্পষ্ট প্রতীয়মান। অতিধিবিদায়ের পরম

অঙ্গ আদাৰ বা নমস্কৃতেৰ পুনৰাবৃত্তি। ‘আবাৰ আস্থন’ উক্তি
সৌজন্য বা ধৰ্মিৰ জ্ঞান কৰে দিতে পাৰে।

গাজী রহমানেৰ দোলাচল অত সহজে কাটে না। গত দেড়
মাসেৰ ছবিশুলো হঠাৎ তাৰ সামনে নিৱস্তুৱ কুমিকতায় খুলে যেতে
লাগল। তখন সে ভাবলে, সীমান্ত অভিকৰ্ম অগন্ত্য যাবা নয়।
বিভীষিকাৰ আকৰ্ষিক ঝাপটা এল এক দমকা। সামনে তিন কৰক
মুণ্ড-হাতে বৃত্যমান সজোৱে ঠ্যাঃ তুললে তাৰ মুখে লাখি দিতে।
আঘৰক্ষাৰ প্ৰতিবৰ্তী ক্ৰিয়ায় সে একপাশে সৱে গেল। সৈয়দ
আলি অবাক হয়। অবিশ্বিত তাৰ হাতে আৱ সময় নেই। বিপদেৰ
বুকি তো আছে। কিন্তু বেশী বুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানেৰ কাজ নয়।
তাই স্বভাৱজ স্বৰে একেলা দিলে একটি মাত্ৰ শব্দে, “স্থাৱ—!”

—তোমাৰ কথা-ই ঠিক। শৰীৱ তো সারতে হয়।

“আৱ দেৱী কৱবেন না।” সৈয়দ আলিৰ অশুরোধে কিছু ক্ষোভ
মেশানো ছিল। একবয়সী হলে সে বলে বসত, “এত দেৱীতে
বুঁচলেন?”

গাজী রহমানেৰ মনে হয়, এমন স্বেহবিগলিত দৃষ্টি দিয়ে সে আৱ
কখনও কিছু স্পৰ্শ কৱেনি। সৈয়দ আলিৰ মুখেৰ দিকে তাৰ চোখ
অপলক। অজ্ঞানিতে নিজেৰ হাত সে সৈয়দ আলিৰ দুই কাঁধে তুলে
দিলে এবং উচ্চারণ কৱলে, কষ্টস্বৰে অসীম পৱিত্রাপজ্ঞাত লজ্জা মিশিয়ে,
“তোমাৰ পৱিচয় মোটেই পেলাম না, এই দুঃখ রয়ে গেল।”

—গোলামেৰ কোন পৱিচয় থাকে না, স্থাৱ। গোলাম
গোলামই। স্বাধীন বাংলাদেশই হবে আমাৰ পৱিচয়।

সৈয়দ আলি আৱ কিছু বললে না, নিজেৰ অৱৰণ যেন খুলে
ধৰলে শুধু।

স্বত্ত্বত গাজী রহমান কয়েক মিনিট নিৰ্বাক। ওই অখ্যাত
চেহাৱা, অজ্ঞাতকুলশীল যুবকেৰ মুখ থেকে চোখ সৱিয়ে নিতে পাৰে
না সে। কাঁধে দুই হাত ছিল। গাজী রহমান সবেগে সঙীকে
বুকে টেনে নিয়ে উচ্চারণ কৱে, “সৈয়দ আলি...আলি...” শুধু

ନାମସହୋଥିନ ଏଥାନେ ଶେଷ କଥା ନଥି । ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେହଙ୍କ କୋନଦିନ ତାକେ ଏମନ ଅବୀଭୂତ କରେନି ।

ଆଲିଙ୍ଗନେର ବେଡ଼ ଯଥାରୀତି ଥାକେ । ଗାଜୀ ରହମାନ ବଲେ, “ଆମାର ଏକଟା କାଜ ତୋମାକେ କରନ୍ତେ ହବେ ।”

କିମଣ ରାୟ, ରେଜୀ ଆଲିଙ୍ଗ ଛବି ହଠାତ୍ ଗାଜୀ ରହମାନ ଦେଖନ୍ତେ ପାଇଁ । ତଥନେଇ ମନେ ପଡ଼େ, ଦୁଃଖନେ ତାର ଭାବାବେଗ ଦେଖିଲେ ଏଥନ କୀ ଭାବତ ? ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଆଲିଙ୍ଗନମୁକ୍ତ ଗାଜୀ ରହମାନ ସ୍ଵାଭାବିକ କଟେ ପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ଚିଟି ବେର କରେ ବଲେ, “ଏଟା ଆମାର ଛାତ୍ର ଇଉନ୍କ ଚୌଧୁରୀକେ ନିଜେ ପୌଛେ ଦିଓ ।”

ଖାମ ହାତେ ନିଯେ ଉପରେ ଠିକାନା ଦେଖେ ସୈୟଦ ଆଲି ବିଶ୍ୱଯ ପ୍ରକାଶ କରେ, “ଉପରେ ଲେଖା ସଥିନା ଚୌଧୁରାଗୀ !”

—ସଥିନା ଓର ଶ୍ରୀ ।

—ଦେବୋ, ଶାର । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକେନ ।

—ଆମାର ବଡ଼ ମେବା କରେଛିଲ ।

—ଦେବ, ଶାର । ଏବାର ଆସି ।

ସୈୟଦ ଆଲି ବିଦାୟ ନିଲେ । ତାର ଗମନପଥେର ଦିକେ ହୃଦୟ ଗାଜୀ ରହମାନ ବହୁକଳ ଚେଯେ ଥାକତ, କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଟିଲା ଦୁଃଖନିଟି ସବ ଆଡ଼ାଲ କରେ ଦିଲେ ।

ନିଜେର ପଥ ଧରିଲେ ଗାଜୀ ରହମାନ । ମେ ଯେନ ତାର ନିଜେର କାହେଇ ଅପରିଚିତ ଅନ । ମୟୁଥେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ, ପେହନେ ଶ୍ରୀ-ପୁତ୍ରକଞ୍ଚା ସଂମାର । କିନ୍ତୁ କିଛୁଇ ତାର ଚୋଇ ପ୍ରତିଭାତ ହୟ ନା । ସମ୍ପଦର ମତ ଅଳୀକ ପୃଥିବୀ ତାର କାହେ ଆରୋ ସ୍ଵପ୍ନମୟ ହୟେ ଶୁଠେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜୁବ୍ୟ ଟିଲାର ଲଭାଗୁଲାବୁତ ଗଞ୍ଜୀର ହରିଂ କୁନ୍ଦ-ବିଶାଳସ୍ତ ତାକେ ହଟିଯେ ନିଯେ ଯାଏ ଅନ୍ତ ମାନସଲୋକେ । ନିଃଖାଲ ନିତେ ବୁକ ଭରେ ଉଠିଲ । ପେହନ ଫିରେ ମେ ଏକବାର ଦେଖେ ନିଲେ ଏବଂ ଅମୁଭବ କରିଲେ, ପଞ୍ଚାଶ ହାଜାର ବର୍ଗ ମାଇଲ ତାର ଚୋଥେର କୋଟିରେ ବନ୍ଦୀ । ଧର୍ବିଭା

বাংলাদেশ তার অস্তরঙ্গিত বিদীর্ণতা-অধীর লাভাকৃণি সকল
আলা-প্রবাহ নিসর্গের মোড়কে ঢেকে শাস্ত শুয়ে আছে।

বুকের ভেতর কত যত্নণা দেড় মাস ধরে। গাজী রহমান
কোনদিন চোখের পানি ফেলেনি, কিরণ রায় এবং রেঙ্গ আলি তাকে
যতই বিজ্ঞপ করুক না কেন। আজ অলঙ্কিতে তার গওদেশ ডিজে
যাব। তা মোছার চেষ্টা পায় না পর্যন্ত গাজী রহমান। গন্তব্য
চিলার কাছাকাছি আসা-মাত্র সে অভ্যন্তর করে যেন আর-এক
অর্গরাঙ্গে তার পদার্পণ ঘটবে। কোথাও হয়ত অমরাবতী নেই
পৃথিবীতে। কিন্তু মাহুষের পোড়া মাংসগন্ধ অস্তত তার আণশক্তি
আর পীড়িত করবে না।

“মিথ্যের সঙ্গে এই হোক আমার শেষ আপস।” মনে মনে
উচ্চারণ করলে গাজী রহমান। সখিনার কথা তার শৃঙ্খলাপথে ধাক্কা
দিতে থাকে। সৈয়দ আলির হাতে যে চিঠি সে দিয়েছে, গত রাত্রে
মজুর চাবীদের বাড়িতেই লেখা। চোখে ঘূম ছিল না। বহু
শ্বানি তো বিভীষিকার যতই তাকে উল্লিঙ্গ করে রেখেছে। মুখস্থ
আছে, দৃশ্যতঃও সখিনাকে লেখা চিঠি যেন দেখতে পেলে গাজী
রহমানঃ

“মা, আমার দোয়া জানিও। তোমাদের সেবায়ত্ত আমি ইহজন্মে
ভূলিতে পারিব না। যদি খোদা চাহেন, আবার তোমাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ ঘটিবে...

“...ইউনুফকে আমার দোয়া দিও। অমন ছেলে আর হয়
না। তোমরা স্মর্থী হও। ইহা আমার অস্তরের সাতিশয় কামনা।
তোমাদের সংসার সুন্দর হউক...

“খালেদের সহিত আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু এখানে
শুনিয়াছি, মুক্তি কৌজদের মধ্যে তার বীরত্বের খুব নামডাক আছে।
কিছুদিন আগে নাকি এই বর্জারে ছিল। এখন অন্ত জ্বালগায় বদলী
হইয়াছে। তাহার অন্ত চিন্তা করিও না। জন্মভূমির ডাক তাহাকে
স্বরহাড়া করিয়াছে। এমন ডাক শুধু সৎ, সুন্দর এবং ভাগ্যবানেরাই

শুনিতে পায়। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের সেবায় উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করা। খালেদ তেমন পথই বাছিয়া লইয়াছে। মৃত্তি ফৌজেরা আমাদের গর্ব। দেশের প্রতি ভালবাসা তাহাদের নিকট হেঁদো কথা নয়। প্রাণ-সোপরদ প্রতিজ্ঞায় অটল মুক্তিফৌজেরা আমাদের জন্য নতুন সমাজ গঠন করিতেছে—যেন দেশবাসী সকল ছৎখ-দারিজের হাত হইতে মুক্তি পায়, নিজেদের জীবন নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। খালেদের কাজে তোমার বুক বোন হিসাবে ভরিয়া ওঠা উচিত।

“অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঢ়াইতে পারে শুধু বীর পুরুষের। মুক্তিফৌজের ব্রত তাই কঠিন। এমন কঠিনের সাথমা গ্রহণ করিয়াছে আমাদের নকুল-মণি মুক্তিফৌজবুন্দ। এই বীর-দল মানুষ হওয়ার পথ সৃষ্টি করিতেছে.....মুক্তিফৌজের কীর্তি যুগ যুগ ইতিহাসের বুকে ধ্বনিত হইবে। তুমি কথাটা বুঝিতে পারিবে কি না জানি না, তবু লিখিলাম। মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের বুকের নিশান, মানুষকে চিরদিন সঠিক পথের ইশারা জানাইবে....”

“মিথ্যের সঙ্গে এই হোক আমার শেষ আপস”, আবার মনে মনে উচ্চারণ করলে গাজী রহমান। আকস্মিকভাবে সে অস্তুভব করলে, একদিন পরিবেশ ঈষৎ মিথ্যার অভিমুখে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আজ তো তেমন চাঃঃ নেই। তবু কেন ছলনার জ্বাল আকীর্ণ করে চলেছে সে ? একবার শুন হলে তার জ্বের থেকে যায়। বুট, বুটের জন্মদাতা। কিন্তু গাজী রহমান আরো উপলক্ষ্মি করে, অনুশোচনার দক্ষ শলাকা আজ তাকে তেমন পোড়ায় না। একটি মানব কি মানবীর প্রাণে, যখন কারা অধৈ দ্রুঃখে আশ্রয় থেঁজে, এমন ভেলা ভাসিয়ে দিলে অস্ত্রায় কোথায় ? পরিবেশের দায় আছে সত্তি, কিন্তু তার দিক যদি শূন্যে টেকে, মানব হিসেবে তার পরিচয় মূল্য থাকে না। জড়পিণ্ডের সামিল তখন সে। বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঢ়ানোর জন্যে অস্ত্রাঞ্চ অন্ত্রের মত আস্ত্রিক হাতিয়ার কম প্রয়োজনীয় নয়।

ବୀନଗର ଯାଆଇ ଦିନେ ସୁଦେଶ ଡୁକରାନି କାହା ଅଭିପ୍ରେସ
ଅମହାୟ ବିକାଶ ମାତ୍ର । ସେ-କର୍ଯ୍ୟର ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ଦିଲ୍ଲୋହିଲି
ଲୁଟେ ଯୋଗଦାନେ ଅର୍ଥିକାର ମାରକତ, ତାରା ମହି ଅଧିବା ମୂର୍ଖ ? ଏହି
ପ୍ରଶ୍ନର ଜ୍ବାବ ସୋଜାମୁଜି ଦିଲେ ନା ଗାଜୀ ରହମାନ । ଅଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱରେ
ଧାରା ତାକେ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ୍ତରେ ଯେତେ ଧାର୍ଥ କରଲ । ସୋଜାମୁଜି ଚିନ୍ତାୟ ହୃତ
ମେ । ଆଶ୍ର୍ଯ ! ଏତଦିନ ପ୍ରବମାନ ଶୋଲାର ମତ ମେ ଚେଉୟେ ଚେଉୟେ
ନାଜେହାଲ କୋନ ଏକ ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯେତ, ଅନ୍ତର୍କ୍ଷେର୍ତ୍ତର ଖବର ରାଖିତ
ନା, ସଦିଓ ମେ ଜାନତ ଜଳେର ଉପରକାର ଗତିମୁଖ ତାର ଆସଲ ପରିଚୟରେ
ଛଞ୍ଚିବେଶ ମାତ୍ର । ଏଥିନ ସଚେତନଭାବେ ମେ ହଦିସ ସକ୍ଷାନେ ତ୍ରପ୍ତର ।

ପଦକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ଆହେ ଏତ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟେଓ । ଗାଜୀ ରହମାନ,
ଆକାଶେର ଦିକେ ମୁଖ ତୁଳେ ଚାଇଲେ । ତାର ଏତ ବିଷ୍ଟାର ଯେନ ମେ
ଆର କଥନଓ ଦେଖେନି । ଶୁର୍ବେର ମୋଲାଯେମ ଆଲୋ ଏବଂ ନୀଳେର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ
ଅଭିଦାର ତାକେ ଏତ ମୁଝ କରେ ସେ, ହଠାତ୍ ଧାମତେ ଇଚ୍ଛା ହୟ । ତଥନଇ
ଶ୍ଵାନ-ସଚେତନ, ତାର କାହେ ଧରା ପଡ଼େ, ମେ ଆର ଜାହାଜମେ ନେଇ ।
ସୈୟଦ ଆଲିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଟିଲାର ପାଦଦେଶେ ଏସେ ପୌଚେହେ । ମାନବ-
ମାନବୀର ପୋଡ଼ା ମାଂସଗଙ୍କ ଅନ୍ତତ ତାକେ ଆର ବିବ୍ରତ କରବେ ନା ।

ଜୋରେ ନିଃର୍ବାସ ନିଲେ ଗାଜୀ ରହମାନ । ଏବାର ଚଲା ବା ବିଶ୍ରାମ
ତାର ମର୍ଜିର ଏକିଯାର । ଥମକେ ଦୀନିଯେ ମେ ଦେଖେ ନିଲେ, ଏବାର ଈଷଂ
ଚଢାଇ ଭାଙ୍ଗତେ ହବେ ତାକେ । ଉପରେ ରାତ୍ରାର ମେଠୋ ଅଂଶ୍ଟକୁ ଦେଖା
ଯାଛେ । ଚତୁର୍ଦିକେ ସବୁଜେର ରାଜ୍ୟ ଓଈଟକୁ ପ୍ରତିବାଦ, ଶୁନ୍ଦର ଗାଲେ
କାଲୋ ତିଲେର ମତ : ଚୋଥେର ବିଶ୍ରାମ । ଫଳେ ଗୋଟା ଏଳାକା ଆରୋ
ମୋହନୀୟ । ନିରବଚିହ୍ନତା, ଏମନ କୀ ମୋଳଦ୍ୟେର, ଆଦୋ ମହିମା ବାଡ଼ାଯା
ନା । ନାନା ଧରନେର କ୍ଲାନ୍ଟି ଏତଦିନ ତାକେ ପିଷେ ମେରେହେ । ଗାଜୀ
ରହମାନ, ଆଜ ପଥଶ୍ରାନ୍ତିର ଅଭିଧାତେ ନାଜେହାଲ । ତାଇ ନିରିଚାର
ଧୂଲୋର ଉପର ଥେବଡ଼େ ବସେ ପଡ଼ିଲୁ ମେ । ଲୁଙ୍ଗିଟା ଏମନି ମୟଲା । ଆରୋ
ମୟଲା ହୋକ । କୀ ଆସେ ଯାଇ ? ଜୀବନେ ନାନା ଉପାଦାନ ଲାଗେ ।
ବଜୁ ଦିକେଇ ସଥିନ ଅମଧ୍ୟ ଘାଟତି, ଏକଟା କମଳେ ଛନିଯା କିଛୁ ଉଣ୍ଟେ
ସାବେ ନା । ଈଷଂ ହେଲାନ ଦେଓଯାର ଲୋଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗେ । ଆବାର ଏକଇ

সুজি । সাম্রাজ্য ধূলো পি঱হানে । বোলা ব্যাগ সিথানে বালিশ হোক । গত রাত্রেও সে ঘুমোয়নি । ওই বিনিজ্ঞতা ততটা নিরাপত্তার আশঙ্কা থেকে নয়, যতটা চিন্তার ধাক্কায় এবং নার্তের অত্যাচারে । আহ, এমনভাবে সে কেয়ামৎ তক্ষণে ধাকতে পারত । উৎপিণ্ডের ডানায় যদিও ঝাঁক্টি কদাচিং আসে ।

বর্জার অতিক্রান্ত । কিন্তু এখনও লোকালয় দূরে । আরো তিন মাইল । সেদিন পথের দৈর্ঘ্য, আর অমন আঘাটাপূর্ণ, তাকে দমাতে পারেনি । আজ সামাজ পথ, এমন সুন্দর মেঠো আকর্ষণ, রীতিমত শত যোজন ঠেকে গাজী রহমানের কাছে । তব উঠতে হয় । লোকালয়ে পৌছলে বাস, বাসে শহর । সেখানেই তার জন্ম আস্তানা অপেক্ষার্থী ।

চোখ থেকে অতীতের পিঁচুটি ধূয়ে গেছে নিরাপত্তার শিশিরে । ভুবনে আনন্দধারা বহমান । গাজী রহমান শরিক । কিন্তু তখনই বিষাদে মন নেতৃত্বে পড়ে । পা আর উঠে না । পেছনে দায়িত্ব বহু মানুষের অপেক্ষার্থী । দ'কে রথের চাকা বসে গেছে । অসংখ্য পেশল হাতই পুনরায় তাদের সহায় । অথচ সে আত্মবিব্রত । যেখানে মিথ্যের উৎস সেখানেই তো তার কর্তব্যভূমি । অথচ আজ সে পলাতক । এই সময় কিরণ রায় এবং রেজা আলির স্মৃতি তাকে রেহাই দিলে । জীবনের পরিধি অল্লে সহজে পরিমাপ করা যায় না । আপাতত ছক হয়ত বৃহস্পতির নকশার সঙ্গে সংগতিহীন । তাই তার মরীচিকায় অত সহজে প্রলুক হওয়া উচিত নয় । অতি-জরাক্রান্ত রোগীর মুখে অসম্ভব দীপ্তি ফুটে উঠে । তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় । তাই উপর্যুক্ত আশা বা নৈরাশ্যকে বেলী শীর্হতি দেওয়া অস্বচ্ছ । বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকালের এই ঘূরপাকে ভবিষ্যৎ অতীত হয়ে পড়ে । পরিকল্পনের ধারা তাই এক কালের বিলু থেকে দেখলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অথচ বর্তমানের দায়িত্ব উপেক্ষা অস্থায় নয় শুধু, আত্মহত্যার সামিল । জটিলতা নিরাকরণের জন্ম যদ্দুর সম্ভব নির্বিকার নির্লিপ্ত হওয়া তাই বাস্তুনীয় ।

ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গাজী রহমান পা ফেলতে লাগল। লয় ক্রত। তু' পাশের বনজ প্রহরীদের দিকে তার চোখ আবার অভই ধায়। অনেক গাছের মে নাম জানে না। কাঠালের মৌসুম বোধ হয়। টিলার নিম্নভূমি জুড়ে শত শত গাছ এই ফলের চোলক গলায় ঝুলিয়ে চুপচাপ ধাঢ়া। আনারসের গাছের সারিশুলো ক্রমিকভায় এমন পোতা যে নৌচে থেকে মনে হবে লাখিয়ে লাখিয়ে উপরে উঠে গেছে অথবা নেমে এসেছে এবং তা একটি মাত্র গাছ, বহু নয়। লিচু ফলে পাঁক ধরেছে, কাকের ছেঁ-মারা ঝাঁপ দেখে হঠাত চোখে পড়ল। বনের মধ্যে যদুর সম্ভব সজ্জিত বাগান। নৈরাজ্যের অকুটি আছে, কিন্তু আইন মানার লক্ষণও স্পষ্ট। বিরলবসতি এইসব এসাকায় নির্জনতার শাসন আদৌ ভাল লাগে না। মাঝুবের সঙ্গ অভিনাবী—গাজী রহমানের মন হঠাত ইতিউতি তাকায়। এক ঝাঁক শালিখ পাখি বনভূমি সচকিত করে উড়ে গেল। গাজীর হাঁটার বিরতি নেই। কিন্তু মন অক্ষমাত্মক জনপদে ফিরে যায়...

মেশিনগানের শুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। কোলাহল, আর্তনাদ। ...সজিনের আগায় গাঁথা শিশু চীৎকার-রত, যখন অগ্নিবোমা তাকে নিমেষে কাবাব বানিয়ে দিলে। অল্লাদ অট্টহাসি পৈশাচিক উল্লাসের শিকার হওয়ার পর পাঞ্চাবী সেনানীর ধর্ষণেছু লালাসিঙ্গ ঠোঁটে ফিরে গেল...প্রসয়ের প্রকল্পে মর্টারের আওয়াজে, রণতরীর শেস-বর্ষণে, কামানের ছক্কারে...অসহায় দীর্ঘশ্বাসের গতিশূল বাতাস যেখানে নির্থক।

কিন্তু সব শব্দ গাজী রহমানের কর্ণপট থেকে নিমেষে মুছে গেল সৈয়দ আলির সংলাপের পুনরুত্থানে: “গোলামের কোন পরিচয় ধাকে না। গোলাম গোলামই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই আমার পরিচয় হোক...”

বাতাসে তাই অগাধ কানাকানি।

গাজী রহমান হঠাত বিপরীতে পেছন কিরলে। পুনরায় জন্মভূমির দিকে মুখ। তারই উদ্দেশ্যে উর্ধ্ববাহ মে মনে মনে

উচ্চারণ করলে :

আবার আসিব ক্ষিরে ধানসিঁড়িটাইর তীরে—এই বাংলায়
কুয়াশার বুকে ভেসে আবার আসিব এই কাঠাল ছায়ায়।

হয়ত কয়েক লহমা।

আবার গন্তব্যমুখী গাজী রহমান।

জয় বাংলা।

এই একটি স্তননের জের শুধু পেছনে পড়ে রইল।
